প্রত্যাশা

একটি মানব উন্নয়ন বিষয়ক ত্রৈমাসিক

- **বর্তমান সময়ে ধর্মভিত্তিক নৈতিকতার অপরিহার্যতা**
  এ.কে.এম. আনোয়ারুল কবীর
- **নীতি-নৈতিকতা সম্পর্কিত কতিপয় বিষয়**
- **সত্যের প্রথম প্রকাশ**
  আয়াতুল্লাহ্ জাফর সুবহানী
- **প্রজ্ঞাময় আলী ইবনে আবি তালিব (আ.)**
  আব্দুল কুদ্দুস বাদশা
- **বেহেশতের নারীদের নেত্রী হযরত ফাতিমা (আ.)**
  মো. আশিফুর রহমান
- **ইসলাম ও ধর্মসমূহের মধ্যে সংলাপ**
  সাইয়্যেদ আবুল ফায্ল মুসাভীয়ান
- **আপনার জিজ্ঞাসা**
- **প্লেটোনিক ধারণা প্রসঙ্গে সাদরুল মোতাআল্লেহীন**
  যাহ্রা মোস্তাফাভী

বর্ষ ২, সংখ্যা ১, এপ্রিল-জুন, ২০১১

প্রত্যাশা • একটি মানব উন্নয়ন বিষয়ক ত্রৈমাসিক • বর্ষ ২, সংখ্যা ১, এপ্রিল-জুন, ২০১১

৫

بسم الله الرحمان الرحيم

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু

আল্লাহ্‌র নামে

প্রত্যাশা

একটি মানব উন্নয়ন বিষয়ক ত্রৈমাসিক

বর্ষ ২, সংখ্যা ১

এপ্রিল-জুন ২০১১

সম্পাদক	:	**এ.কে.এম. আনোয়ারুল কবীর**
সহযোগী সম্পাদক	:	**ড. জহির উদ্দিন মাহমুদ**
নির্বাহী সম্পাদক	:	**মো. আশিফুর রহমান**
উপদেষ্টাম-লী	:	মোহাম্মদ মুনীর হুসাইন খান
		আব্দুল কুদ্দুস বাদশা
		এস.এম. আশেক ইয়ামিন
প্রকাশক	:	মো. আশিকুর রহমান
প্রকাশকাল	:	চৈত্র ১৪১৭- আষাঢ় ১৪১৮
		জমাদিউল উলা-রজব ১৪৩২ হি.
		এপ্রিল-জুন ২০১১ ইং
মূল্য	:	৫০ (পঞ্চাশ) টাকা
যোগাযোগের ঠিকানা	:	দোকান নং ৩৩৬ (৩য় তলা, দক্ষিণ পার্শ্ব), মুক্তবাংলা
(পরিবর্তিত ঠিকানা)		শপিং কমপ্লেক্স, মিরপুর-১, ঢাকা-১২১৬
ই-মেইল	:	prottasha.2010@yahoo.com

Prottasha (Vol. 2, No. 1, April-June, 2011), Editor: A.K.M. Anwarul Kabir; Associate Editor: Dr. Zahiruddin Mahmud; Executive Editor: Md. Asifur Rahman; Advisors: Mohammad Munir Hossain Khan, Mohammad Abdul Quddus Badsha, S.M. Asheque Yamin; Publisher: Md. Ashiqur Rahman; Address: 336 (2nd fl. Right Side), Muktobangla Shopping Complex, Mirpur-1, Dhaka-1216; E-mail: prottasha.2010@yahoo.com

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় ৫

বর্তমান সময়ে ধর্মভিত্তিক নৈতিকতার অপরিহার্যতা ৭

এ.কে.এম. আনোয়ারুল কবীর

নীতি-নৈতিকতা সম্পর্কিত কতিপয় বিষয় ১৩

সংকলন : মো. আশিফুর রহমান

সত্যের প্রথম প্রকাশ ৩৬

আয়াতুল্লাহ্ জাফর সুবহানী

প্রজ্ঞাময় আলী ইবনে আবি তালিব (আ.) ৫৯

আব্দুল কুদ্দুস বাদশা

বেহেশতের নারীদের নেত্রী হযরত ফাতিমা (আ.) ৭০

মো. আশিফুর রহমান

ইসলাম ও ধর্মসমূহের মধ্যে সংলাপ ৯০

সাইয়্যেদ আবুল ফাযল মুসাভীয়ান

আপনার জিজ্ঞাসা ১১৩

প্লেটোনিক ধারণা প্রসঙ্গে সাদরুল মোতাআল্লেহীন ১১৬

যাহ্রা মোস্তাফাভী

Prottasha

A Quarterly Journal of Human Development
Vol. 2, No. 1, April-June, 2011

Table of Contents

Editorial 5

Neccessity of Religion-based Ethics at the Present Time 7
A.K.M. Anwarul Kabir

Some Issues Related to Ethics and Morality 13
Compilation : Md. Asifur Rahman

The First Illumination of Truth 36
Ayatollah Jafar Subhani

Imam Ali Ibn Abi Talib (A.)- The Man of Wisdom 59
Abdul Quddus Badsha

Hazrat Fatima (A.)- Leader of the Women in Paradise 70
Md. Asifur Rahman

Dialogue Among Religions 90
Sayeed Abul Fazl Mousavian

Your Questions 113

Sadr-ol-Mota'allahin on Platonic Ideas 116
Zahra Mostafavi

গ্রাহক চাঁদার হার		
	প্রতি কপি	বাৎসরিক
ডাকযোগে (পোস্টাল চার্জ সহ)	৬০ টাকা	২৪০ টাকা

ডাকযোগে পত্রিকা পেতে গ্রাহক চাঁদা মানি অর্ডার করে নিচের ঠিকানায় প্রেরণ করতে হবে :

মো. আশিফুর রহমান
বাড়ি নং-৪ (পশ্চিম পাশ, নিচতলা), রোড নং-৩, ব্লক- সি, সেকশন-২, মিরপুর, ঢাকা-১২১৬

সম্পাদকীয়

ইসলাম– সহনশীলতার ধর্ম

সাধারণত ধারণা করা হয় যে, কোন ধর্ম যদি নিজেকে একমাত্র সত্যধর্ম বলে দাবী করে এবং অন্য সকল ধর্মকে ভ্রান্ত বলে বিশ্বাস করে তবে সেই ধর্মে সহনশীলতার বিষয়টি উপেক্ষিত হয়। ফলে তা অন্য ধর্মগুলোকে বিলীন এবং তাদের অনুসারীদের দমন করার চেষ্টায় রত হয়। কিন্তু কুরআন ও সুন্নাহর শিক্ষা এবং ইসলামের বিধি-বিধান অধ্যয়ন ও পর্যালোচনা থেকে নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে, ইসলাম নিজেকে একমাত্র সঠিক ধর্ম বলে প্রচার করা সত্ত্বেও এর শিক্ষা ও বিধান কেবল ধর্মীয় সহনশীলতার কথাই বলে না; বরং অন্য ধর্মাবলম্বীদের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সহাবস্থানের বিষয়টির ওপরও গুরুত্ব আরোপ করে। প্রথম যে বৈশিষ্ট্যটি ইসলামের উদারতার পরিচয় বহন করে তা হল এ ধর্ম যখন কাউকে এর প্রতি আহবান জানায় তখন তাকে এটা গ্রহণ করতে বাধ্য করে না। পবিত্র কুরআন এ বিষয়ে সুস্পষ্ট ঘোষণা দিয়েছে যে, ধর্মের (গ্রহণের) বিষয়ে কোন জবরদস্তি নেই (সূরা বাকারা : ২৫৬)। ঐতিহাসিক সাক্ষ্য-প্রমাণও ইসলামের প্রসারের ক্ষেত্রে অন্যদের ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করণের বিষয়টিকে প্রত্যাখ্যান করে। বিশিষ্ট প্রাচ্যবিদ গুস্তাব লুবন অন্য এক গবেষক ও প্রাচ্যবিদ মিশোর সূত্রে উল্লেখ করেছেন, দ্বিতীয় খলিফা হযরত উমরের সময় যখন বায়তুল মুকাদ্দাস বিজিত হয় তখন খ্রিস্টানদের সম্পূর্ণ নিরাপত্তা ও ধর্মীয় স্বাধীনতা দান করা হয়।

দ্বিতীয় যে বৈশিষ্ট্যটি ইসলামকে পরমতসহিষ্ণু ও সহনশীল ধর্ম হিসাবে প্রসিদ্ধি দান করেছে তা হল ইসলাম সংলাপ ও যৌক্তিক বিতর্কের সমর্থক। মহান আল্লাহ্ মহানবী (সা.)-এর প্রতি ইসলামের বাণী প্রচারের দায়িত্ব দানের সাথে সাথে তাঁকে এ নির্দেশ দান করেছেন যে, তোমার প্রতিপালকের পথে প্রজ্ঞা ও উপদেশসহ আহ্বান কর এবং প্রতিপক্ষের সঙ্গে যখন বিতর্ক করবে তখন উত্তম পন্থায় বিতর্ক করবে (সূরা নাহল : ১২৫)। অর্থাৎ ইসলাম অন্য ধর্মাবলম্বীদের সাথে বিতর্কে সকল প্রকার আক্রমণাত্মক ও তিরস্কারমূলক কথা এবং পরিহাসমূলক আচরণ পরিহারের নির্দেশ দিয়েছে। ইসলাম সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করেছে : 'মুশরিকরা আল্লাহকে ছেড়ে যাদের (উপাস্য মনে করে) আহ্বান করে তোমরা তাদের গালি দিও না।' (সূরা আনআম : ১০৮)। এ আয়াত অনুযায়ী অন্য ধর্মাবলম্বীদের উপাস্যই শুধু নয়; বরং তাদের সম্মানিত ব্যক্তিদেরও কোনরূপ অবমাননা করা যাবে না। ইসলাম সংলাপ ও উত্তম পন্থায় বিতর্কের বিষয়টিকে এক বা দুই বৈঠকের জন্য সীমাবদ্ধ রাখেনি; বরং সব সময়ের জন্য তা উন্মুক্ত রেখেছে। তবে অবশ্যই তা যুক্তিনির্ভর হতে হবে এবং যে কোন ধরনের কটাক্ষ, অবমাননা, তিরস্কার ও নিন্দা হতে মুক্ত হবে। এমনকি ইসলাম ঐশী ধর্মের অনুসারীদের মধ্যে সমবিশ্বাসের বিষয়গুলোর ভিত্তিতে ঐক্যের প্রচেষ্টাকে স্বাগত জানায়। এ উদ্দেশ্যে

ইয়াহুদী ও খ্রিস্টধর্মের অনুসারীদের আহ্বান জানিয়ে বলেছে : 'হে আহলে কিতাব! এস সে কথায় যা আমাদের ও তোমাদের মধ্যে একই, যেন আমরা আল্লাহ ব্যতীত কারও ইবাদাত না করি এবং কোন কিছুকেই তাঁর সঙ্গে শরীক না করি।' (আলে ইমরান : ৬৪)

বিধর্মীদের কর্তৃত্ব মেনে না নিয়ে তাদের সঙ্গে যে কোন ধরনের সৌহার্দ্রপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপনকে ইসলাম নিষেধ করে না। মহান আল্লাহ বলেন : 'ধর্মের ব্যাপারে যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেনি এবং তোমাদের স্বদেশ হতে বহিষ্কার করেনি তাদের প্রতি উদারতা প্রদর্শন ও ন্যায়বিচার করতে আল্লাহ তোমাদের নিষেধ করেন না। নিশ্চয় আল্লাহ ন্যায়পরায়ণদের ভালবাসেন। আল্লাহ কেবল তাদের সাথে বন্ধুত্ব করতে নিষেধ করেন যারা দীনের ব্যাপারে তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে এবং তোমাদের স্বদেশ হতে বহিষ্কার করেছে এবং তোমাদের বহিষ্করণে সাহায্য করেছে। যারা তাদের সাথে বন্ধুত্ব করে প্রকৃতপক্ষে তারাই জালিম।' (সূরা মুমতাহিনা : ৮-৯)। এ আয়াতে আল্লাহ বিধর্মীদের সঙ্গে সদাচরণের মানদণ্ড তাদের ধর্মীয় বিশ্বাস বলেননি; বরং মুসলমানদের সঙ্গে যুদ্ধ ও তাদের ওপর নির্যাতন না করাকে সুসম্পর্কের মাপকাঠি নির্ধারণ করেছেন।

ইসলাম সামাজিক সুসম্পর্কের মৌলিক নীতিমালা ও ভিত্তি ক্ষমাপরায়ণতা বলে উল্লেখ করেছে ও বলেছে : '(হে রাসূল!) তুমি ক্ষমাপরায়ণতা অবলম্বন কর, সৎ কাজের নির্দেশ দাও এবং অজ্ঞদের এড়িয়ে চল।' (সূরা আরাফ : ১৯৯)। এ আয়াতে আল্লাহ তাঁর রাসূলকে বিধর্মীদের অস্বীকার এবং দৈহিক ও মানসিক কষ্টদানের জবাব ক্ষমা প্রদর্শনের মাধ্যমে দিতে বলেছেন। এ কারণেই আমরা দেখি, মহানবী (সা.) মক্কা বিজয়ের দিনে তাঁর সকল শত্রুকে ক্ষমা করে দিয়েছিলেন। তিনি ছিলেন মানব-প্রেমের মূর্ত প্রতীক। তিনি বলেছেন : 'সকল মানুষ আল্লাহর সৃষ্টি। তোমাদের মধ্যে সেই তাঁর নিকট সর্বাধিক প্রিয় যে তাঁর সৃষ্ট মানুষের প্রতি সর্বাধিক কল্যাণ করে।' (উসূলে কাফি, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৬৪) মহানবী (সা.) তাঁর বরকতময় জীবনে বিভিন্ন ধর্মের অনুসারীদের সাথে সর্বোত্তম আচরণের নমুনা পেশ করেছেন। তিনি ইসলামী ভূখণ্ডে বসবাসকারী আহলে কিতাবদের (ইয়াহুদী ও খ্রিস্টান) যেমন জিম্মী চুক্তির অধীনে পূর্ণ নিরাপত্তা দান করেছেন, তেমনি মুশরিক-কাফিরদের সাথে দ্বিপাক্ষিক চুক্তি করে তাদের জীবন, সম্পদ ও সম্ভ্রমের নিরাপত্তা নিশ্চিত করেছেন। তিনি সকল অবস্থায় যুদ্ধবিরতি ও সন্ধিকে স্বাগত জানিয়েছেন এবং মহান আল্লাহর এ নির্দেশ 'তারা যদি সন্ধির দিকে ঝুঁকে পড়ে, তবে তুমিও সন্ধির দিকে ঝুঁকবে এবং আল্লাহর ওপর নির্ভর করবে' (সূরা আনফাল : ৬১) এবং 'সুতরাং তারা যদি তোমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করা হতে সরে দাঁড়ায়, তোমাদের সঙ্গে যুদ্ধ না করে এবং সন্ধির প্রস্তাব দেয় তবে সেক্ষেত্রে আল্লাহ তাদের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ গ্রহণের পথ রাখেননি' (সূরা নিসা : ৯০)– এর প্রতি অনুগত ছিলেন। সুতরাং নির্দ্বিধায় বলা যায়, ইসলাম ধর্মীয় সহনশীলতার সর্বোচ্চ পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছে এবং এর অনুসারীদের অন্য ধর্মাবলম্বীদের সাথে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের প্রতি উৎসাহিত করেছে।

বর্তমান সময়ে ধর্মভিত্তিক নৈতিকতার অপরিহার্যতা

এ.কে.এম. আনোয়ারুল কবীর

আধুনিক সমাজের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বিভিন্ন রকমের বক্তব্য উপস্থাপিত হয়ে থাকে। পাশ্চাত্য চিন্তাবিদদের মতে আধুনিক বিশ্বের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হল বুদ্ধিবৃত্তি (Rationality)। বিশিষ্ট সমাজবিজ্ঞানী ম্যাক্স ওয়েবারের মতেও বুদ্ধিবৃত্তি হল আধুনিক সমাজের সবচেয়ে লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য। তবে তার দৃষ্টিতে এ বুদ্ধিবৃত্তি হচ্ছে ব্যবহারিক জীবনের হাতিয়ার স্বরূপ। তাই একে Instrumental Rationality বলা যেতে পারে। এ বুদ্ধিবৃত্তি প্রচলিত (Traditional) সকল চিন্তার বিরোধী; সমাজ গঠনে ঐশী বিধানের প্রতি অমুখাপেক্ষিতা এবং বুদ্ধিবৃত্তিকভাবে মানুষের স্বনির্ভরতায় বিশ্বাসী। স্বাভাবিকভাবেই সামাজিক কাঠামো, সংস্কৃতি ও চিন্তাজগতে বুদ্ধিবৃত্তির স্বয়ংসম্পূর্ণতার এ ধারণা সামাজিক জীবনে ধর্মের ন্যূনতম প্রয়োজনকেও স্বীকার করে না। তাই এ মতের ভিত্তিতে আধুনিক সমাজজীবনে ধর্ম সম্পূর্ণ অকার্যকর হয়ে পড়া ও এর প্রতি মানুষের আগ্রহ সর্বনিম্ন পর্যায়ে চলে যাওয়াই স্বাভাবিক বলে পরিগণিত। কিন্তু তাঁদের এ ধারণাকে ভুল প্রমাণ করে বর্তমান বিশ্বে মানুষ দিন দিন ধর্মের প্রতি অধিকতর ধাবিত হচ্ছে। এ কারণে বারগারের দৃষ্টিতে বর্তমান বিশ্বের যে কোন সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বিষয় পর্যালোচনায় ধর্মকে উপেক্ষা করা বড় এক ভুল বলে পরিগণিত। মরিস বারবিয়ার মতে বর্তমানে ইউরোপের বাইরে যুবকদের মধ্যে নৈতিকতা ও আধ্যাত্মিকতার প্রতি আগ্রহ এবং ধর্মীয় অনুভূতি বৃদ্ধি পাওয়ার বিষয়টি ধর্মের সঙ্গে রাজনৈতিক আদর্শের গভীর সংযোগ এবং রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ধর্মীয় বিষয়ের অনুপ্রবেশ থেকে উৎসারিত। এ বিষয়টি সাম্প্রতিক সময়ে ধর্মের সফল আত্মপ্রকাশের স্বাক্ষর বহন করছে। এর ওপর ভিত্তি করেই মালরো মন্তব্য করেছেন, তৃতীয় সহস্রাব্দ হয় ধর্মের সহস্রাব্দ নতুবা তার অস্তিত্ব

থাকবে না। জুলি স্কট বলেছেন, বর্তমান সময়ে ধর্মবিষয়ক সমাজবিজ্ঞানের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব হল সাম্প্রতিক বিশ্বে ধর্মের উন্নয়নের গতিকে বোঝার চেষ্টা করা। কেননা, আমরা তৃতীয় সহস্রাব্দে প্রবেশের সাথে সাথে ধর্মের লক্ষণীয় অগ্রগতির মুখোমুখি হয়েছি। মানবেতিহাসে এ ব্যাপক পরিবর্তন আমাদের সামনে এ প্রশ্ন উত্থাপন করছে যে, আধুনিক সমাজে ধর্মের এ নবজাগরণের কারণ কি আধুনিক বুদ্ধিবৃত্তির অক্ষমতা ও দুর্বলতার মধ্যে নিহিত নাকি এ বিষয়টি ধর্মভিত্তিক নৈতিকতার কার্যকরী প্রভাব এবং ধর্ম ও নৈতিকতার প্রতি মানুষের সর্বকালীন মুখাপেক্ষিতার ফল? আমাদের দৃষ্টিতে এ দু'টি কারণ বর্তমান সময়ে সমন্বিত হয়ে এ অবস্থার সৃষ্টি করেছে।

আধুনিক জীবনে বুদ্ধিবৃত্তি মানুষের প্রবৃত্তিগত চাহিদা পূরণের হাতিয়ারে পরিণত হয়েছে যা কেবল মানুষের বস্তুগত চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে ব্যবহৃত হচ্ছে। এ দাবি প্রমাণের জন্য সাম্প্রতিক সমাজে প্রচলিত ঘটনাসমূহ পর্যালোচনাই যথেষ্ট। বিশ্বসমাজ নৈতিক অধঃপতনের চূড়ান্ত সীমায় পৌঁছেছে, অন্যায়-অবিচার ব্যক্তিগত পর্যায়ের সীমা ছাড়িয়ে সামাজিক, রাষ্ট্রীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে পৌঁছেছে। আধুনিক বুদ্ধিবৃত্তি অন্যায়কে ন্যায়, মিথ্যাকে সত্য, মন্দকে ভাল, অকল্যাণকে কল্যাণ রূপে উপস্থাপন করে বিবেকসমূহকে লোহার খাঁচায় বন্দি করেছে। সুতরাং প্রকৃত দৃষ্টিতে আধুনিক বুদ্ধিবৃত্তিকে বুদ্ধিবৃত্তির অনুপস্থিতি বলা যেতে পারে।

অতি হিসেবী, সুবিধাবাদিতা, স্বার্থপরতা, আত্মাহীন ছক বাঁধা জীবন, নৈতিকতাকে উপেক্ষা, আত্মবিস্মৃতি ও উদাসীনতা, মানবিক দায়িত্বহীনতা, ধ্বংসকামী প্রবণতা প্রভৃতি সংকট আধুনিক মানুষকে লক্ষ্যহীন, গৌণ ও নিরর্থক এক সত্তায় পরিণত করেছে। বিশেষজ্ঞরা এ অবস্থা থেকে উত্তরণের চিন্তায় রয়েছেন। তাঁদের অনেকেই মুক্তির সর্বোত্তম পথ ধর্মের দিকে প্রত্যাবর্তন বলেছেন। মার্টিন হোয়াইটগার উপরিউক্ত সমস্যার সমাধান শুধু স্রষ্টাই করতে পারেন বলে মন্তব্য করেছেন। কিউটিটের মতে, দুনিয়ামুখী ও বস্তুবাদী বুদ্ধিবৃত্তি একটি সময় পর্যন্ত আধুনিক সংস্কৃতির এক বড় অংশকে নিজের অধীনে আনতে সক্ষম হলেও অতি দ্রুত তার অকার্যকারিতা ও অক্ষমতা ফুটে উঠেছে এবং ঐতিহ্যবাহী ধর্মগুলোর স্থান দখলে ব্যর্থ হয়েছে। কারণ, মানুষের ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনে ধর্মের অপ্রতিস্থাপনীয় কার্যকর ভূমিকা রয়েছে; ধর্মহীন ও ধর্মনিরপেক্ষ সভ্যতা তার সুদীর্ঘ একচ্ছত্র আধিপত্যের যুগে তা পূরণে

অক্ষম হয়েছে। গ্রিফিন বিশ্বাস করেন, আধুনিক বিশ্বদৃষ্টি যা অভিজ্ঞতা, ইন্দ্রিয়নির্ভর জ্ঞান, অবাধ স্বাধীনতা ও বুদ্ধিবৃত্তিকে হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহারের তত্ত্ব-নির্ভরতা স্রষ্টাহীনতা, নীতি ও মূল্যবোধের আপেক্ষিকতা, বস্তুবাদিতা, জীবনের অর্থহীনতা, সামরিক ও পেশীশক্তির প্রাধান্য এবং নব্য গোত্রবাদে পর্যবসিত হয়েছে। অবশ্য পরবর্তীগুলোকে প্রথমটির অর্থাৎ স্রষ্টাহীনতা ও ধর্মহীনতার ফল বলা যায়। এ বিষয়গুলো মানুষের ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনে অসংখ্য নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছে যা নব্য আধুনিকতাবাদের ধারক নতুন এক বিশ্বের জন্ম দিয়েছে। সিডমন্ডের দৃষ্টিতে ধর্মনিরপেক্ষ মতের সমর্থক ও সমালোচক উভয় পক্ষের লোকেরা এ বিষয়ে একমত যে, ধর্মনিরপেক্ষ সংস্কৃতি ও মতবাদ বর্তমান যুগের মানুষের ব্যক্তিগত, নৈতিক ও সামাজিক জীবনকে পরিচালনার উপযোগী কাঠামো উপস্থাপনে সক্ষম নয়। তাই ধর্মের দিকে প্রত্যাবর্তন অপরিহার্য হয়ে পড়েছে।

আধুনিকতাবাদ অপর যে সমস্যার মুখোমুখি তা হল মানুষের প্রকৃত পরিচয় ও সামাজিক সম্পর্কসমূহের রূপ সম্পর্কে তার অজ্ঞতা। মানুষের পরিচালনামূলক ও প্রমোদমূলক আচরণের বিপরীতে পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনামূলক আচরণ সকল সময় পরিকল্পনা, কর্মসূচি, কর্মপদ্ধতি ও উপকরণ নির্বাচনের ওপর নির্ভরশীল। দৈনন্দিন জীবনে ক্ষুদ্র ও ব্যষ্টিক পর্যায়ে (micro level) পরিকল্পনা প্রণয়নে মানুষের বুদ্ধিবৃত্তি উপকারী ভূমিকা পালনে সক্ষম। কিন্তু মানুষের সামগ্রিক জীবনের সকল দিকের জন্য কল্যাণকর ও ভারসাম্যপূর্ণ সার্বিক পরিকল্পনা প্রণয়ন কোন একক ব্যক্তির জন্য তো সম্ভব নয়ই, এমনকি সামষ্টিকভাবেও এ বিষয়টি তার ক্ষমতার ঊর্ধ্বে। কারণ, প্রথমত মানুষের নিকট তার আত্মপরিচয়, বিশেষত তার সামাজিক জীবনের বিভিন্ন দিক ও সম্পর্ক সবচেয়ে অজানা বিষয়। দ্বিতীয়ত মানুষের আত্মা অমর এক সত্তা এবং তার জন্য রয়েছে এক অনন্ত জীবন যার কল্যাণ ও অকল্যাণ সম্পর্কে জানা বুদ্ধিবৃত্তির জন্য অসম্ভব এক বিষয়। কারণ, এ সম্পর্কে তার কোন অভিজ্ঞতা নেই। এখানেই সার্বিক জীবন পদ্ধতির রূপরেখা দানকারী এক জীবনাদর্শের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। এরূপ সকল বিষয়কে ধারণ করে এমন জীবনাদর্শ কেবল ওহী দ্বারাই পূরণ হওয়া সম্ভব।

উল্লেখ্য, সাধারণত অজ্ঞতাবশত বর্তমান বিশ্বের সকল প্রকার উন্নতিকে বুদ্ধিবৃত্তিনির্ভর আধুনিকতার ফল বলে গণ্য করা হয়ে থাকে। কিন্তু এ বিষয়টি সঠিক নয়। কারণ,

আধুনিক সভ্যতার বস্তুগত দিকের উন্নয়নে ধর্ম, বিশেষত ইসলাম কোন কোন ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষভাবে, আবার কোন কোন ক্ষেত্রে পরোক্ষভাবে ভূমিকা পালন করেছে।

যদিও ইসলামী সভ্যতা স্বল্প কয়েক শতাব্দীর জন্য শাসন করেছে, কিন্তু সে স্বল্প সময়েই প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের গুরুত্বপূর্ণ ভূখ-সমূহের ওপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠায় সক্ষম হয় এবং মানব সভ্যতার ইতিহাসে আমূল পরিবর্তন ঘটায় ও বিশ্বকে অন্ধকার থেকে আলোর দিকে টেনে আনে।

মানুষের উৎপত্তির সময় থেকেই ধর্ম উন্নত নৈতিক চরিত্র, ন্যায় ও সত্যের প্রতি ভালবাসা এবং মানুষের কল্যাণের জন্য আবশ্যকীয় কর্মকে তাদের সামনে তুলে ধরেছে ও এর দিকে উদ্দীপনা সৃষ্টির ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছে। কারণ, ধর্ম ব্যতীত অন্য কোন কারণ ও নিয়ামক মানবেতিহাসে বিদ্যমান নেই যা মানুষকে উন্নত চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, সত্যনিষ্ঠা, ন্যায়পরায়ণতা, মানবীয় আচরণ ও উপযুক্ত কর্মের প্রতি উদ্বুদ্ধ করবে। পাশ্চাত্য সভ্যতার ইতিবাচক দিকগুলো ইসলামী সভ্যতার সাথে পরিচয়ের পর উদ্ভূত হয়েছে এবং তা এ সভ্যতার সম্প্রসারণের মাধ্যমেই ঘটেছে। ম্যাকস ওয়েবার ও পার্সোনেজ আধুনিক বিশ্বের অর্থনীতি, রাজনীতি, বিজ্ঞান, শিল্পকলা, রাষ্ট্রীয় কার্য পরিচালনা, ঐক্য, শৃঙ্খলা, স্বাধীনতা, স্বনির্ভরতা সর্বোপরি জ্ঞানগত উন্নতি ও সার্বিক দক্ষতার মূল খ্রিস্ট ধর্মের শিক্ষায় নিহিত বলে দাবি করেছেন। যদিও এ কথা সর্বৈবভাবে গ্রহণযোগ্য নয়, কিন্তু ধর্মের –অবশ্য যদি তা সঠিক অর্থে ধর্ম হয়– যে এরূপ ক্ষমতা রয়েছে তা অবশ্যই সত্য।

ধর্মহীন নৈতিকতার প্রধান দু'টি ধারাই দায়িত্ববোধকেন্দ্রিক (Deontologist) ও উদ্দেশ্যকেন্দ্রিক (Teleologist) নৈতিকতাকে বুদ্ধিবৃত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত করেছে। তাদের মধ্যে কেউ কেউ এক্ষেত্রে নৈতিকতার বিকাশে ধর্মের প্রয়োজনীয়তার বিষয়টি স্বীকার করলেও অধিকাংশই ধর্মের প্রতি অমুখাপেক্ষিতার দাবি করেছেন। পরিণতিতে এ দুই মত আত্মত্যাগ, অপরকে প্রাধান্য দান, নিঃস্বার্থ হওয়া, পরোপকার, ক্ষমা, স্বীয় স্বার্থ বিরোধী হলেও সত্য ও ন্যায়ের পক্ষ অবলম্বন ইত্যাদি বিষয়গুলো বস্তুবাদী চিন্তায় বুদ্ধিবৃত্তির পরিপন্থী কাজ বলে বিবেচিত হওয়ায় অর্থহীন গণ্য হয়েছে। কারণ, এরূপ কর্মসমূহের বিপরীতে বস্তুগত কোন প্রতিদান তো পাওয়া যায়ই না বরং বঞ্চিত হতে হয়। উদ্দেশ্যকেন্দ্রিক নৈতিকতায় বিশ্বাসীরা যাঁরা সামগ্রিক স্বার্থের কথা বলেন তাঁদের দৃষ্টিতেও যেক্ষেত্রে ব্যক্তির জন্য কোন লাভই অর্জিত হয় না সেক্ষেত্রে এ

ধরনের কর্ম নিরর্থক। কিন্তু যে চিন্তাধারা নৈতিক কর্মের ভিত্তিকে ধর্ম ও অতিপ্রাকৃতিক অসীম সত্তার সাথে সম্পর্কিত বলে বিবেচনা করে তাদের দৃষ্টিতে নৈতিকতার বিষয় অর্থপূর্ণ ও বুদ্ধিবৃত্তিক বিষয়। কারণ, এ কর্মগুলো মানুষ হয় তার স্রষ্টার সান্নিধ্য ও সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য অথবা পারলৌকিক পুরস্কার লাভের আশায় করে থাকে। অর্থাৎ সে তার স্রষ্টার নিকট থেকে প্রাপ্ত নিয়ামতের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন বা পারলৌকিক মুক্তির জন্য তা করে। তাই তা যৌক্তিক এক কর্ম বলে বিবেচিত। এ দৃষ্টিকোণ থেকে কোন কোন নৈতিক মৌলনীতিকে যদি ধর্ম থেকে বিচ্ছিন্ন করে শুধু বুদ্ধিবৃত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করা হয় তবে তা অর্থহীন হয়ে পড়বে। কারণ, বস্তুগত দিক দিয়ে এরূপ কর্মের কোন অর্থ হয় না। এ মতের ভিত্তিতেই রোনাল্ড এম. গ্রিন বলেছেন, 'দার্শনিক ও চিন্তাবিদদের একদল এ বিষয়ের ওপর খুবই গুরুত্ব দিয়েছেন যে, অতিপ্রাকৃতিক সজ্ঞান সত্তা (পরাবস্তু) ও বিভিন্ন ধর্মে বিশ্বাসী মতসমূহ নৈতিক জীবনের উদ্দেশ্য ও কারণ ব্যাখ্যা এবং এরূপ জীবনের প্রতি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ থাকা ও দায়িত্ববোধ সৃষ্টির ক্ষেত্রে মূল্যবান ভূমিকা পালন করে। এ সকল দার্শনিক তাঁদের মতের সপক্ষে যুক্তি হিসাবে বলেন, ন্যূনতম ধর্মীয় ও অতিপ্রাকৃতিক চিন্তাগত ভিত্তি ছাড়া সকল প্রকার নৈতিক প্রচেষ্টা অর্থহীনতায় পর্যবসিত হবে।'

ইমানুয়েল কান্টের মতেও নৈতিকতার বিষয়সমূহ অর্থবহ হওয়া ও কার্যকারিতা লাভের জন্য ধর্মের মুখাপেক্ষী। যদিও কান্ট নৈতিকতার স্থান ধর্মের পূর্বে বলে মনে করেন, কিন্তু তিনি তাঁর শেষ লেখনীগুলোতে যে চিন্তাধারা উপস্থাপন ও সেটাকে শক্তিশালী করার জন্য যুক্তি উপস্থাপন করেছেন তা হল মানুষের নৈতিক প্রচেষ্টাসমূহ অর্থপূর্ণ হওয়ার জন্য এমন খোদার প্রতি বিশ্বাস রাখা আবশ্যক যিনি আমাদের নৈতিক ইচ্ছাসমূহের ব্যাপারে পূর্ণ অবহিত এবং তার বিচারক।

গোল্ডনারের মতে, কোন বিধান নৈতিক বা অনৈতিক হওয়ার বিষয়টি সকলের নিকট গ্রহণযোগ্য হওয়ার জন্য শর্ত হল নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে তা নির্ধারিত হয়েছে অর্থাৎ তার নিরপেক্ষ একটি মানদ- রয়েছে। সমাজে প্রচলিত কোন আইন বা নীতি স্রষ্টার পক্ষ থেকে প্রণীত হওয়া তা নিরপেক্ষ হওয়ার অন্যতম প্রমাণ। যদি স্রষ্টাকে নৈতিকতার উৎস বলে ধরা হয়, তবে এর মাধ্যমে নীতিমালা প্রণয়নের ক্ষেত্রে বিশেষ কোন দলের পক্ষপাতিত্বের বিষয়টি আনুষঙ্গিকভাবে প্রত্যাখ্যাত হয়। ফলে নৈতিক ন্যায়পরায়ণতা পবিত্র একটি বিষয় হিসাবে সর্বজনগ্রাহ্য হয়। নৈতিক বিষয়গুলোকে যখন পবিত্র বলে

গণ্য করা হবে তখন মানুষ তা অনুসরণে উৎসাহিত হবে। তাঁর মতে, আইন-কানুন যখন স্রষ্টার সঙ্গে সম্পর্কিত করা হবে তখন তা নিরপেক্ষভাবে সকলের ওপর প্রযোজ্য হবে যা ঐ বিধানসমূহের বৈধতা লাভের কারণ হয়। এ কারণে মানুষ স্বাভাবিকভাবে তা পালনে উদ্বুদ্ধ হয়। শহীদ আয়াতুল্লাহ্ মোতাহ্হারীর ভাষায় : মানবতার উৎস হল আল্লাহ্-পরিচিতি। মানবতা, মনুষ্যত্ব ও নৈতিকতা আল্লাহ্-পরিচিতি ছাড়া সম্ভব নয়। অর্থাৎ আধ্যাত্মিকতার কোন বিষয়ই তার পরম্পরার সমাপ্তি যদি নৈতিকতার মূলে (আল্লাহ্তে) না ঘটে তা অর্থহীন... যদি তার মূল মানবাত্মায় প্রোথিত না হয়, তবে তাকে মানবতা বলা যায় না। তার সঙ্গে মনুষ্যত্বের কোন সম্পর্ক নেই... যদি (আল্লাহ্র প্রতি) ঈমান না থাকে, তবে এরূপ নৈতিকতা জাল টাকার ন্যায় যার কোন মূল্য নেই।

অন্যত্র তিনি বলেছেন : 'ধর্ম নৈতিকতার ভিত্তি হওয়ার মাধ্যমে নৈতিকতাকে নিশ্চিত করে। যদি নৈতিকতাকে পূর্ণরূপে বাস্তবায়িত করতে হয়, তবে ধর্মের ভিত্তিতে ও তার সমর্থনে তা হতে হবে। এ বিষয়টি নিশ্চিত যে, ধর্ম অন্ততপক্ষে নৈতিকতার পৃষ্ঠপোষক হিসাবে অপরিহার্য ভূমিকা পালন করে। কারণ, প্রথমত ইতিহাস ও অভিজ্ঞতা সাক্ষ্য দান করে যে, যেখানেই নৈতিকতা থেকে ধর্ম বিচ্ছিন্ন হয়েছে এবং ধর্ম দুর্বল হয়ে পড়েছে সেখানেই স্বয়ং নৈতিকতা দুর্বল হয়েছে ও পিছিয়ে পড়েছে। দ্বিতীয়ত ধর্ম দুর্ভেদ্য নৈতিক শৃঙ্খলা সৃষ্টি ও শক্তিশালী নিয়ন্ত্রকের ভূমিকা পালন করতে সক্ষম। তৃতীয়ত যে সকল চিন্তাবিদ নৈতিকতার বিষয় নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করেন তাঁরা এ বিষয়টি স্বীকার করেছেন যে, ধর্ম নৈতিকতার সর্বোত্তম পৃষ্ঠপোষক।'

সুতরাং বর্তমান সময়েও ধর্ম নৈতিকতার নিশ্চয়তা দানকারী হিসাবে মানব জাতির রক্ষকের ভূমিকা পালন করছে এবং এর অনুপস্থিতিই নৈতিক বিপর্যয়ের সৃষ্টি করছে। এ বিষয়টি আধুনিক সমাজে নতুন করে ধর্মীয় জাগরণের কারণ।

নীতি-নৈতিকতা সম্পর্কিত কতিপয় বিষয়

সংকলন : মো. আশিফুর রহমান

সমাজ ও জাতিসমূহের উন্নতি বিধানের ক্ষেত্রে আচার-আচরণ একটি অত্যাবশ্যকীয় উপাদান। মানুষের অন্তরের সুখ-শান্তি ও আনন্দ বিধানের ক্ষেত্রে আচার-আচরণের যে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রয়েছে তা কেউ অস্বীকার করে না। উন্নত আচার-আচরণ এত প্রয়োজনীয় যে, যে সব জাতি ধর্মে বিশ্বাস করে না, তারাও একে সম্মান করে এবং এটা বিশ্বাস করে যে, জীবনের এই কঠিন পথে অগ্রগতি সাধন করতে হলে তাদেরকে অবশ্যই কিছু নৈতিকতার বিধি মেনে চলা দরকার। আমরা উন্নত বিশ্বের দিকে দৃষ্টি দিলে দেখতে পাই যে, সেখানে ধর্ম-কর্ম পালন করাকে তারা খুব প্রয়োজনীয় বিষয় বলে মনে করে না; কিন্তু নীতি-নৈতিকতার অনেক বিষয় তারা খুব কঠোরভাবে মেনে চলে। যেমন তারা মিথ্যা কথা বলে না, প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে না, যে সব কাজের দায়িত্ব তাদের ওপর অর্পণ করা হয় সেগুলো যথাযথভাবে আঞ্জাম দেয়, সময়ের গুরুত্ব দেয় ইত্যাদি। আর এরকম কিছু কিছু নীতি মেনে চলার ফলেই আজ তারা উন্নতির চরম শিখরে আরোহণ করতে পেরেছে।

ইসলাম মানুষকে আল্লাহ্‌র শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি হিসাবে ঘোষণা করেছে এবং তার ওপর অনেক দায়িত্ব অর্পণ করেছে। তারা আল্লাহ্‌র ইবাদাত করবে এবং একই সাথে অন্য মানুষের সাথে আচরণের ক্ষেত্রেও আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য চেষ্টা করবে। কারণ, সমাজে বসবাসের জন্য অন্যের সাথে আচরণের দিকটিই প্রধান হয়ে দেখা দেয়। তাই আচরণের গুরুত্ব অপরিসীম– কি আমাদের জীবন পথে চলার জন্য, কি আখেরাতে মুক্তির জন্য। উত্তম আচরণ সম্পর্কে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) বলেছেন : 'সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ বৈশিষ্ট্যসমূহ যা আমার উম্মতকে বেহেশতে দাখিল করবে তা হচ্ছে আল্লাহ্‌র ভয় ও উত্তম আচরণ।'[১]

মহানবী (সা.) আরও বলেছেন :

إنّ من أخيركم أحسنكم خلُقًا

'তোমাদের মধ্যে সেই সর্বাপেক্ষা উত্তম যার নৈতিক চরিত্র ও আচরণ ভাল।'[২]

অন্য একটি হাদীসে এসেছে :

إنّ خياركم أحاسنكم أخلاقا

'তোমাদের মধ্যকার সর্বাধিক চরিত্রবান ব্যক্তিই সর্বোত্তম।'[৩]

রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন :

أكْملُ الْمؤمنِين إيمانا أحسنهم أخلاقًا

'সেই মুমিনই ঈমানে পূর্ণতর যে চরিত্রে অধিকতর উত্তম।'[৪]

উত্তম চরিত্র সম্পর্কে আলী (আ.)-কে উপদেশ দিতে গিয়ে মহানবী (সা.) বলেন : 'হে আলী! উত্তম চরিত্রের অন্তর্ভুক্ত তিনটি কাজ : যে ব্যক্তি তোমার সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করেছে তার সাথে সম্পর্ক গড়বে, যে তোমাকে বঞ্চিত করেছে তাকে তুমি দান করবে আর যে তোমার প্রতি অন্যায় করেছে তাকে তুমি ক্ষমা করবে।'[৫]

মানুষের সাথে আচরণ সম্পর্কে হযরত আলী (আ.) বলেন : 'মানুষের সাথে দেখা হলে এমন আচরণ করবে যেন তোমার মৃত্যুতে তারা কাঁদে এবং তুমি বেঁচে থাকলে তোমার দীর্ঘায়ু কামনা করে।'[৬]

রাসূলুল্লাহ্ মন্দ স্বভাবের অধিকারীদের ঘৃণা করতেন। তিনি বারবার বলেছেন : 'মন্দ স্বভাব হচ্ছে খারাপ এবং বদ স্বভাবের অধিকারী লোক তোমাদের মধ্যে নিকৃষ্ট।'[৭]

রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন :

إن شر الناس منزلةً عند اللهِ من تركه أو ودعه الناس اتقَاءَ فُحشة

'আল্লাহ্ তা'আলার নিকট সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট হল সেই ব্যক্তি যার অশালীন ও অসভ্য আচরণ থেকে বাঁচার জন্য মানুষ তাকে পরিত্যাগ করে।'[৮]

নম্র ব্যবহার সম্পর্কে রাসূল (সা.) বলেছেন :

إن الله رفيق يحب الرفْق في الْأمرِ كُله

'নিশ্চয় আল্লাহ্ হলেন নম্র ও দয়ার্দ্র, তিনি প্রতিটি বিষয়ে নম্রতা ও দয়া প্রদর্শন পছন্দ করেন।'[৯]

তিনি আরও বলেন :

من يحرمِ الرفْق يحرمِ الْخير

'যে ব্যক্তি নম্র স্বভাব বঞ্চিত, সে যাবতীয় কল্যাণ থেকে বঞ্চিত।'[১০]

রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর আচরণ সম্পর্কে হযরত আনাস ইবনে মালিক বলেন : 'নবী (সা.) যখন কোন ব্যক্তির সাথে সাক্ষাৎ করতেন এবং কথা বলতেন তখন সে মুখ ফিরিয়ে না নেয়া পর্যন্ত তিনি তাঁর মুখ ফিরিয়ে নিতেন না এবং যখন কারও সাথে মুসাফাহা করতেন, তখন সে তার হাত সরিয়ে না নেয়া পর্যন্ত তিনি তার নিকট থেকে নিজের হাত সরিয়ে নিতেন না। তাঁর সাথে উপবিষ্ট লোকদের দিকে পা ছড়িয়ে দিয়ে তাঁকে কখনও বসতে দেখা যায়নি।'[১১]

রাসূল (সা.) বলেন,

إن التوضع يزِيد صاحبه رفعة فَتواضعوا يرفَعكُم اللهُ

'নিঃসন্দেহে নম্রতা মানুষের মর্যাদাকে সুউচ্চ করে। সুতরাং বিনয়ী হও যেন আল্লাহ্ তোমাদের সম্মান দান করেন।'[১২]

রাসূল (সা.) আরও বলেন :

زِينةُ الشرِيف التواضع

'ভদ্রলোকের অলংকার হল বিনয় বা নম্রতা।'[১৩]

উত্তম আচরণ এবং সদা হাসি-খুশী থাকার উপকারও রয়েছে। ইমাম জাফর সাদিক (আ.) বলেছেন : 'দয়া ও নম্র ব্যবহার জমিনকে অধিক ফলনশীল করে এবং মানুষের আয়ু বৃদ্ধি করে।'

বিখ্যাত মনস্তত্ত্ববিদ ড. স্যান্ডারসন এ বিষয়ে উল্লেখ করেছেন : 'রোগের প্রতিরোধ ও নিরাময়ের ব্যাপারে দয়া অত্যন্ত প্রয়োজনীয় একটা উপাদান। অনেক ঔষধ রোগমুক্তির সাথে সাথে অবাঞ্ছিত পার্শ্ব প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে, অথচ দয়া স্থায়ী রোগমুক্তি ঘটিয়ে দেহের সকল অংশকে রোগমুক্ত করে। পরোপকারিতা দেহের সকল শক্তিকে প্রভাবিত করে, ভাল আচরণকারীদের রক্ত সঞ্চালন অত্যন্ত চমৎকার এবং শ্বাস-প্রশ্বাস ক্রিয়াও অপেক্ষাকৃত ভাল।'[১৪]

উত্তম আচরণের গুরুত্ব রয়েছে অনেক বিষয়েই। তা শুধু শরীরকে সুস্থ রাখে না, বরং এর পাশাপাশি জীবনোপকরণও বৃদ্ধি করে। আলী (আ.) বলেছেন : 'সদাচরণ প্রচুর পরিমাণে জীবনোপকরণ বৃদ্ধি এবং বন্ধুত্বের সম্পর্কের ঘনিষ্ঠতাকে বাড়িয়ে দেয়।'

সমাজবিজ্ঞানী এস, মার্দিন তাঁর গ্রন্থে এ কথাগুলো উল্লেখ করেছেন : 'আমি এমন একজন রেস্ট্রুরেন্ট ম্যানেজারকে জানি যিনি তাঁর অমায়িক ব্যবহারের ফলে অনেক সম্পদশালী ও জনপ্রিয় হয়েছেন। আমি জানতে পারলাম যে, পর্যটকরা অনেক দূর-দূরান্ত থেকে তাঁর রেস্ট্রুরেন্টে আসত, এজন্য যে, ঐ রেস্ট্রুরেন্টের নির্জনতা ও আনন্দদায়ক পরিবেশ তাদের কাছে অত্যন্ত ভাল লাগত। খদ্দেররা রেস্ট্রুরেন্টে থাকাকালীন ম্যানেজার তাদেরকে এমন সানন্দ সম্ভাষণ জানাতেন, যা তারা আর কোথাও দেখতে পায়নি। বস্তুতপক্ষে অন্যান্য রেস্ট্রুরেন্টে যেখানে অভিযোগের পর অভিযোগ করেও সাড়া পাওয়া যেত না এমন পরিস্থিতি এ রেস্ট্রুরেন্টে কেউ কখনও হতে দেখেনি। এই রেস্ট্রুরেন্টের কর্মচারীরা খদ্দেরদের সাথে স্বাভাবিক ক্রেতা-বিক্রেতার সম্পর্কের উর্ধ্বে অত্যন্ত আন্তরিকতা ও বন্ধুত্বের সম্পর্ক গড়ে তুলত। কর্মচারীরা অত্যন্ত হাসি-খুশী সহকারে খদ্দেরদের সেবাযত্নের প্রতি বিশেষ মনোযোগ প্রদর্শন করত। এ বিশেষ মনোযোগ অতিথিদের প্রতি তাদের প্রীতি ও শুভেচ্ছার মনোভাব হতে উদ্ভূত। কর্মচারীরা তাদের অতিথিদের সাথে এমন সম্পর্ক গড়ে তুলত যা তাদের মধ্যে পুনরায় এখানে আসার আগ্রহ সৃষ্টির মধ্যেই সীমিত থাকত না; বরং তারা তাদের বন্ধুদেরও এখানে নিয়ে আসত।'[১৫]

ইমাম সাদিক (আ.) প্রফুল্লতাকে মানুষের বিচার-বিশ্লেষণ করার ক্ষমতার একটি লক্ষণ হিসাবে গণ্য করেছেন। তিনি বলেছেন : 'মানুষের মধ্যে যাদের পরিপূর্ণ যুক্তিজ্ঞান ও বিচার-বিশ্লেষণ করার ক্ষমতা রয়েছে তারাই হল সর্বোত্তম আচার-আচরণের অধিকারী।'[১৬]

রাসূল (সা.) বলেন : 'সচ্চরিত্র তার অধিকারীকে সারাদিন রোযা রাখা ও সারারাত জেগে ইবাদাত করা ব্যক্তির সমান মর্যাদায় পৌঁছে দেয়।'[১৭]

উত্তম ব্যবহার সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে :

وَلَا تَسْتَوِى ٱلْحَسَنَةُ وَلَا ٱلسَّيِّئَةُ ۚ ٱدْفَعْ بِٱلَّتِى هِىَ أَحْسَنُ فَإِذَا ٱلَّذِى بَيْنَكَ وَبَيْنَهُۥ عَدَٰوَةٌ كَأَنَّهُۥ وَلِىٌّ حَمِيمٌ ﴿٣٤﴾

'আর ভাল ও মন্দ সমান হতে পারে না। মন্দ প্রতিহত কর উৎকৃষ্ট দ্বারা; ফলে তোমার সাথে যার শত্রুতা রয়েছে, সে তোমার অন্তরঙ্গ বন্ধুর মতো হয়ে যাবে।'[১৮]

একদিন ইমাম আলী ইবনুল হুসাইন যায়নুল আবেদীন (আ.) তাঁর অনুসারীদের নিয়ে বসেছিলেন। এমন সময় এক ব্যক্তি সেখানে উপস্থিত হয়ে তাঁকে অপমান করতে লাগল। এ লোকটির নাম ছিল হাসান মুসান্না। ইমাম সাজ্জাদ লোকটির কথার প্রতি গুরুত্ব দিলেন না। লোকটি চলে যাবার পর তিনি তাঁর অনুসারীদের বললেন : 'আমি চাই যে, আপনারা আমার সঙ্গে গিয়ে শুনবেন যে, লোকটিকে আমি কী জবাব দেই।' ইমাম সাজ্জাদ (আ.)-এর অনুসারীরা তদুত্তরে বললেন : 'আমরা আপনার সঙ্গে যাব যদিও আমরা চেয়েছিলাম যে, আপনি বা আমরা লোকটিকে উচিত জবাব দেই।'

ইমাম পবিত্র কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াত পড়তে পড়তে লোকটির গৃহাভিমুখে রওয়ানা হলেন :

وَٱلَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا۟ فَٰحِشَةً أَوْ ظَلَمُوٓا۟ أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا۟ ٱللَّهَ فَٱسْتَغْفَرُوا۟ لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ ٱلذُّنُوبَ إِلَّا ٱللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا۟ عَلَىٰ مَا فَعَلُوا۟ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿١٣٥﴾

'এবং যারা কোন অশ্লীল কাজ করে বসে অথবা নিজেদের প্রতি অবিচার করে, অতঃপর আল্লাহকে স্মরণ করে নিজেদের গুনাহসমূহের ক্ষমা প্রার্থনা করে। আর আল্লাহ ব্যতীত গুনাহ মার্জনাকারী কে আছে? এবং তারা জেনে-বুঝে যা করেছে তার ওপর গোঁয়ারতুমি করে না।'[১৯]

এ কথা শোনার পর ইমামের সাথীরা এ সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন যে, ইমাম সাজ্জাদ (আ.) লোকটিকে কিছু সদয় কথাই বলবেন। ইমাম সাজ্জাদ (আ.) হাসান মুসান্নার বাড়ি পৌঁছলেন এবং বললেন : 'তাকে বলুন, এ হচ্ছে আলী ইবনুল হুসাইন।'

লোকটি এ কথা শুনে তাঁর সাথে মোকাবিলা করার প্রস্তুতি নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে আসল। সে নিশ্চিতভাবে মনে করেছিল যে, ইমাম সাজ্জাদ তার কৃত কাজের প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য এসেছেন। হাসান মুসান্না এসে উপস্থিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ইমাম সাজ্জাদ বললেন : 'হে আমার ভাই! আপনি আমার কাছ গিয়ে কিছু কথাবার্তা বলেছেন। আপনি আমার সম্পর্কে যা কিছু বলেছেন তা যদি সত্যই আমার মধ্যে থাকে, আমি আল্লাহ্‌র কাছে ক্ষমা চাচ্ছি, আর যদি এমন কোন বিষয়ে আপনি আমাকে অপরাধী সাব্যস্ত করে থাকেন যে ব্যাপারে আমি নিরপরাধ তাহলে আমি আল্লাহ্‌র কাছে আপনার জন্য ক্ষমা চাইছি।'

লোকটি ইমাম সাজ্জাদ (আ.)-এর কথা শোনার পর তাঁর কপাল চুম্বন করল এবং বলল : 'প্রকৃতপক্ষে আমি এমন সব বিষয়ে আপনাকে অভিযুক্ত করেছিলাম যে ব্যাপারে আপনি নিরপরাধ। এ কথাগুলোর মধ্যে আমার অবস্থানের বর্ণনাই রয়েছে।'[২০]

ইমাম সাজ্জাদের কথাগুলো লোকটির অন্তরকে নাড়া দিল ও তা তার ব্যথার উপশম ঘটাল। তার দুঃখ ও অনুশোচনার মনোভাব তার অঙ্গভঙ্গির মধ্যে সুস্পষ্টভাবে প্রকাশিত হল।

চরিত্র গঠন সম্পর্কিত মতবাদ

চরিত্র গঠন সম্পর্কে দু' ধরনের মতবাদ প্রচলিত আছে। প্রথম মতবাদ হল মানুষের চরিত্র খনির মতো। একে পরিবর্তন করা যায় না। মানুষ যে বংশে জন্মগ্রহণ করে সে বংশের বৈশিষ্ট্যই তার মধ্যে থাকে। অর্থাৎ বংশই মানুষের চরিত্রকে নিয়ন্ত্রণ করে।

দ্বিতীয় মতবাদ : এ মতবাদে বলা হয়েছে যে, মানুষের চরিত্র পরিবর্তন করা যায়। যদি কাউকে যথোপযুক্ত পরিবেশ দেয়া যায় এবং তাকে উন্নত শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ দেয়া যায় তাহলে তার চরিত্রে পরিবর্তন আনা সম্ভব। এ বিষয়টি কঠিন হলেও অসম্ভব নয়। আর এ মতবাদটিই সঠিক।

মানুষের প্রবৃত্তি

মানুষের প্রবৃত্তি দুই প্রকার। যথা : পাশবিক ও আধ্যাত্মিক।

রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন : 'আল্লাহ্ ফেরেশতাদের বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করেছেন আকল (বিবেক-বুদ্ধি) দিয়ে এবং প্রবৃত্তি ও রাগ দেননি; পশুকে দিয়েছেন প্রথমটি ছাড়া শুধু প্রবৃত্তি ও রাগ, কিন্তু মানুষকে আকল এবং প্রবৃত্তি ও রাগ দিয়ে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করেছেন। মানুষ যদি তার প্রবৃত্তি ও রাগকে আকল দিয়ে নিয়ন্ত্রণ করে তাহলে সে ফেরেশতাদের থেকেও উৎকৃষ্ট হতে পারবে।'

মানুষকে তার প্রবৃত্তির সঠিক ব্যবহার করতে হবে। প্রবৃত্তির কম ব্যবহারের ফলে তার বিকাশ বাধাপ্রাপ্ত হয়, আবার প্রবৃত্তির অধিক ব্যবহারের ফলে সে পথভ্রষ্টতায় পতিত হয়। তাই মানুষকে দৈহিক ও আত্মিক উভয় দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

জিহাদে আকবার (বড় যুদ্ধ)

তাবুকের যুদ্ধ হতে মদীনায় প্রত্যাবর্তনের পর মহানবী (সা.) বললেন : 'তাদেরকে আমার শুভেচ্ছা যারা ছোট যুদ্ধ হতে ফিরে এসেছে, কিন্তু বড় যুদ্ধ এখনও বাকী।' সবাই জিজ্ঞেস করল : 'সেটা কোন্ যুদ্ধ?' তিনি বললেন : 'সেটা হল নাফ্সের বিরুদ্ধে যুদ্ধ।'

নাফসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কেন বড় যুদ্ধ?

নাফসের বিরুদ্ধে যুদ্ধকে বড় যুদ্ধ বলার পেছনে নিম্নের কারণগুলো উল্লেখ করা যায় :

১. মানুষের অস্তিত্বে সবসময় একটি পরস্পরবিরোধী শক্তি কাজ করে : একটি ভাল, একটি মন্দ। তাকে সব সময় মন্দের মোকাবিলা করতে হয়।

২. মানুষের জীবনের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত এই জিহাদ চলে।

৩. এই জিহাদই মানুষের পরিপূর্ণতা লাভের প্রক্রিয়া। কারণ, সত্য-মিথ্যার দ্বন্দ্বের মাধ্যমেই মানুষ চূড়ান্তভাবে বিকশিত হয়। দ্বন্দ্বের উপস্থিতি না থাকলে বিকাশ সম্ভব নয়।

৪. ছোট জিহাদে অনেক সময় মানুষ গনীমতের মালের লোভে অংশগ্রহণ করে এবং বিজয়ের মাধ্যমে তা লাভ করে। কিন্তু বড় জিহাদে এ সব কিছু পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা একেবারেই অমূলক।

৫. এ জিহাদের জয়-পরাজয়ই মানুষের ভাগ্য নির্ধারণ করে।

সচ্চরিত্রের আলামত

মানুষ নিজের দোষ-ত্রুটি সম্বন্ধে সব সময় সচেতন থাকে না। তাই যখন সামান্য সাধনা করে বড় বড় পাপকর্ম ছেড়ে দেয় তখন মনে করতে থাকে যে, সে চরিত্রবান হয়ে গেছে। এখন সাধনার প্রয়োজন নেই। কিন্তু চরিত্রবান হওয়া আসলেই কঠিন কাজ। আর একজন প্রকৃত মুমিন মানেই সত্যিকার চরিত্রবান।

পবিত্র কুরআনে এ মুমিনদের চরিত্রের আলামত সম্পর্কে বলা হয়েছে :

قَدْ أَفْلَحَ ٱلْمُؤْمِنُونَ ۝١ ٱلَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَٰشِعُونَ ۝٢ وَٱلَّذِينَ هُمْ عَنِ ٱللَّغْوِ مُعْرِضُونَ ۝٣ وَٱلَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَوٰةِ فَٰعِلُونَ ۝٤ وَٱلَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَٰفِظُونَ ۝٥ إِلَّا عَلَىٰٓ أَزْوَٰجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَٰنُهُمْ

'মুমিনগণ সফলকাম হয়েছে, যারা নামাযে বিনম্র, যারা অসার ক্রিয়াকলাপ থেকে বিরত থাকে, যারা যাকাত দানে সক্রিয়, যারা নিজেদের যৌন অংগকে সংযত রাখে নিজেদের পত্নী অথবা অধিকারভুক্ত দাসিগণ ব্যতীত...।'[২১]

অন্য একটি আয়াতে বলা হয়েছে :

ٱلتَّٰٓئِبُونَ ٱلْعَٰبِدُونَ ٱلْحَٰمِدُونَ ٱلسَّٰٓئِحُونَ ٱلرَّٰكِعُونَ ٱلسَّٰجِدُونَ ٱلْأَٰمِرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَٱلنَّاهُونَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَٱلْحَٰفِظُونَ لِحُدُودِ ٱللَّهِ ۗ وَبَشِّرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۝١١٢

'তারা তওবাকারী, উপাসনাকারী, (আল্লাহর) প্রশংসাকারী, তাঁর পথে সফরকারী, রুকুকারী, সেজদাকারী, সৎকর্মের নির্দেশ দানকারী, অসৎ কর্ম হতে নিষেধকারী, আল্লাহর সীমারেখার সংরক্ষণকারী; (হে রাসূল!) বিশ্বাসীদের তুমি (বেহেশতের) সুসংবাদ দাও।'[২২]

সূরা ফুরকানে মহান আল্লাহ্ মুমিনদের পরিচয় দিয়েছেন এভাবে :

وَعِبَادُ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلَّذِينَ يَمۡشُونَ عَلَى ٱلۡأَرۡضِ هَوۡنٗا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ ٱلۡجَٰهِلُونَ قَالُواْ سَلَٰمٗا ﴿٦٣﴾ وَٱلَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمۡ سُجَّدٗا وَقِيَٰمٗا ﴿٦٤﴾ وَٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا ٱصۡرِفۡ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَۖ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا ﴿٦٥﴾ إِنَّهَا سَآءَتۡ مُسۡتَقَرّٗا وَمُقَامٗا ﴿٦٦﴾ وَٱلَّذِينَ إِذَآ أَنفَقُواْ لَمۡ يُسۡرِفُواْ وَلَمۡ يَقۡتُرُواْ وَكَانَ بَيۡنَ ذَٰلِكَ قَوَامٗا ﴿٦٧﴾ وَٱلَّذِينَ لَا يَدۡعُونَ مَعَ ٱللَّهِ إِلَٰهًا ءَاخَرَ وَلَا يَقۡتُلُونَ ٱلنَّفۡسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلۡحَقِّ وَلَا يَزۡنُونَۚ ...

'রহমান' এর বান্দা তারাই যারা পৃথিবীতে নম্রভাবে চলাফেরা করে এবং তাদেরকে যখন অজ্ঞ ব্যক্তিরা সম্বোধন করে, তখন তারা বলে, 'সালাম'; এবং তারা রাত্রি অতিবাহিত করে তাদের প্রতিপালকের উদ্দেশ্যে সিজদাবনত হয়ে ও দণ্ডায়মান থেকে; এবং তারা বলে, হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের থেকে জাহান্নামের শাস্তি বিদূরিত কর, এর শাস্তি তো নিশ্চিত বিনাশ,' নিশ্চয়ই তা অস্থায়ী ও স্থায়ী আবাস হিসাবে নিকৃষ্ট। এবং যখন তারা ব্যয় করে তখন অপব্যয় করেন না, কার্পণ্যও করে না; বরং তারা আছে এতদুভয়ের মাঝে মধ্যম পন্থায়। এবং তারা আল্লাহ্‌র সাথে কোন ইলাহকে ডাকে না। আল্লাহ্ যার হত্যা নিষেধ করেছেন যথার্থ কারণ ব্যতিরেকে তাকে হত্যা করে না এবং ব্যভিচার করে না।...'[২৩]

যদি মানুষের অবস্থা এ আয়াতগুলোর সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হয় তবে তার সচ্চরিত্র অর্জিত হয়েছে বুঝতে হবে। আর যদি কোন সঙ্গতি না থাকে, তবে এটি অসচ্চরিত্রের আলামত।

রাসূলে কারীম (সা.) মুমিনের অনেক গুণ বর্ণনা করে সচ্চরিত্রের দিকে ইঙ্গিত করেছেন। যেমন :

ٱلمؤمن من يحب لأخيه ما يحب لنفْسِه

'মুমিন সে-ই যে তার ভাইয়ের জন্য তা-ই পছন্দ করে, যা নিজের জন্য পছন্দ করে।'

মহানবী (সা.) বলেন :

من كانَ يؤمن بِاللهِ و الْيومِ الْآخرِ فَلْيكْرِم ضيفَه و من كانَ يؤمن بِاللهِ و الْيومِ الْآخرِ فَلْيصلْ رحمه و من كانَ يؤمن بِاللهِ و الْيومِ الْآخرِ فَلْيقُلْ خيرا أو ليصمت

'যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও আখেরাতের ওপর ঈমান রাখে সে যেন অবশ্যই তার মেহমানকে সম্মান করে এবং যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও আখেরাতের ওপর ঈমান রাখে সে যেন অবশ্যই আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও আখেরাতের ওপর ঈমান রাখে সে যেন ভাল কথা বলে অথবা চুপ থাকে।'[২৪]

মহানবী (সা.) আরও বলেন :

من سرته حسنةٌ و ساءَته سيئَةٌ فَهو مؤمن

'যাকে পুণ্য কাজ আনন্দিত করে এবং কুকর্ম দুঃখিত করে সেই মুমিন।'

কেউ কেউ সচ্চরিত্রের সকল আলামতকে একত্রে সন্নিবেশিত করেছেন এবং বলেছেন : সচ্চরিত্রবান সেই ব্যক্তি যে অধিক লজ্জাশীল, অধিক উপদেশদাতা, স্বল্পভাষী, অধিক কর্মী, সত্যবাদী, সাধু, গম্ভীর, ধৈর্যশীল, কৃতজ্ঞ, সন্তুষ্ট, সহনশীল, উত্তম সঙ্গী, পুণ্যবান, স্নেহশীল, প্রফুল্ল এবং যে কুভাষী, অপবাদদাতা, হিংসুটে, বিদ্বেষ পরায়ণ ও কৃপণ নয়, শত্রুতা আল্লাহ্র নিমিত্তেই করে এবং সন্তুষ্টি ও মহব্বতও আল্লাহ্র ওয়াস্তেই করে। এগুলো দিয়ে সচ্চরিত্রবান বোঝা যায়।

সচ্চরিত্রের সর্বোচ্চ নমুনা রাসূলুল্লাহ্ (সা.)

রাসূল মিষ্টভাষী ছিলেন এবং ছোট-বড়, ধনী-দরিদ্র সবার সাথে কোমল আচরণ করতেন। রাসূলের কোমলতা সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ বলছেন :

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ لِنتَ لَهُمْ ۖ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ ٱلْقَلْبِ لَٱنفَضُّوا۟ مِنْ حَوْلِكَ ۖ

'(হে রাসূল!) আল্লাহর পক্ষ থেকে এ এক অনুগ্রহ যে, তুমি তাদের প্রতি দয়ার্দ্রচিত্ত হয়েছ। যদি তুমি রুক্ষ মেজাজ ও কঠিন হৃদয়সম্পন্ন হতে তবে অবশ্যই তারা তোমার চারপাশ থেকে ছত্রভঙ্গ হয়ে যেত।'[২৫]

মহান আল্লাহ্ ঘোষণা করছেন :

لَّقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ

'রাসূলের মধ্যে রয়েছে তোমাদের জন্য উত্তম আদর্শ।'[২৬]

আর মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) নিজেই বলেছেন :

بعثت لمكارم الأخلاق

'মহৎ গুণাবলীর পূর্ণতা প্রদান করার জন্যই আমি প্রেরিত হয়েছি।'[২৭]

আর মহানবী (সা.)-এর দেয়া প্রতিটি বিষয় গ্রহণ করার জন্য মহান আল্লাহ্র নির্দেশ হচ্ছে :

وَمَآ ءَاتَىٰكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَىٰكُمْ عَنْهُ فَٱنتَهُوا۟

'রাসূল তোমাদের যা দেন তা গ্রহণ করো এবং যা নিষেধ করেন তা থেকে বিরত থাক।'[২৮]

উপরিউক্ত আয়াত ও রাসূলের বাণী অনুযায়ী আমাদের চারিত্রিক গুণাবলী অর্জনের জন্য রাসূলের শরণাপন্ন হতে হবে। তিনি যাঁদেরকে অনুসরণ করতে বলেছেন তাঁদের শরণাপন্ন হতে হবে। তাঁদের জীবন থেকে আমরা শিক্ষা নেব। তাঁরা যেভাবে চলতে বলেছেন সেভাবে চলব। আর যেভাবে চলতে নিষেধ করেছেন সেভাবে চলা থেকে বিরত থাকব। তবেই আমরা সফলকাম হতে পারব।

নবী (সা.)-এর খাদেম আনাস ইবনে মালিক প্রায়ই বলতেন : 'আমি দশ বছর নবীর খেদমতে নিয়োজিত ছিলাম। এ সময়ের মধ্যে আমি যা কিছু করতাম বা না করতাম তিনি আমাকে কখনও উহ্ পর্যন্ত বলেননি।'[২৯]

মহানবী (সা.)-এর জীবনের একটি ঘটনা এখানে উল্লেখ করা প্রাসঙ্গিক। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) একদিন একটি নাজরানী চাদর পরিধান করে পথ চলছিলেন। এক বেদুঈন পথিমধ্যে রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর চাদর ধরে এমন জোরে টান দিল যে, চাদরের পাড় তাঁর ঘাড়ে বসে গেল। বেদুঈন বলল : 'হে মুহাম্মাদ! তোমার কাছে আল্লাহ্র যে

সম্পদ আছে তা থেকে আমাকেও দাও।' রাসূল সেই বেদুঈনের দিকে তাকালেন এবং স্মিত হেসে তাকে কিছু দান করলেন।

যখন রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর প্রতি কুরাইশদের নির্যাতনের মাত্রা চরমে পৌঁছে গিয়েছিল তখনও তিনি মহান আল্লাহ্র কাছে এভাবে দো'আ করতেন :

اَللّٰهم اغْفر لقَومي فَإنهم لَا يعلَمونَ

'হে আল্লাহ্! আমার কওমকে ক্ষমা করুন, তারা জানে না।'

অনেকে বলেন, এ দো'আটি রাসূল (সা.) উহুদের যুদ্ধের পর করেছিলেন।

আর রাসূল (সা.)-এর এসব গুণের কারণেই মহান আল্লাহ্ বলেছেন :

إنك لَعلَى خلُقٍ عظيمٍ

'নিঃসন্দেহে তুমি মহান চরিত্রের অধিকারী।'[৩০]

ইমামদের জীবনেও আমরা তাঁদের উন্নত নৈতিক চরিত্রের অসংখ্য উদাহরণ দেখি।

একবার ইমাম আলী (আ.) তাঁর গোলামকে ডাকলেন। সে জবাব দিল না। এরপর তিনি দ্বিতীয়বার ও তৃতীয়বার ডাকলেন। কিন্তু গোলামের পক্ষ থেকে কোন সাড়া পাওয়া গেল না। অতঃপর তিনি গোলামের কাছে গিয়ে দেখলেন যে, সে শুয়ে আছে। তিনি জিজ্ঞেস করলেন : তুমি কি আমার ডাক শোননি?' গোলাম বলল : 'শুনেছি।' তিনি বললেন : 'তাহলে কেন জবাব দিলে না?' গোলাম বলল : 'আপনি আমাকে প্রহার করবেন– এ ভয় আমার মোটেই ছিল না। তাই অবহেলাবশত জবাব দিইনি।' হযরত আলী বললেন : 'যাও আমি তোমাকে আল্লাহ্র ওয়াস্তে মুক্ত করে দিলাম।'[৩১]

চরিত্রবান হওয়া ও নিজেকে চেনা

নিজেদের চরিত্রবান করে গড়ে তোলার জন্য আমাদের চেষ্টা করতে হবে। আমরা আমাদের জ্ঞান অনুযায়ী আচরণ করব, এটিই স্বাভাবিক। তবে সবসময় আমরা সব কিছু সঠিকভাবে করতে পারি না। আবার অনেক অন্যায় আচরণও করে ফেলি

অসচেতনতার কারণে। এগুলো পরিহার করা উচিত। আর এজন্য আমাদের প্রয়োজন রয়েছে নিজেদের চেনার।

প্রকৃতপক্ষে প্রত্যেক ধার্মিক ব্যক্তির বাসনা এটি হওয়া উচিত যে, নিজের দোষ সম্পর্কে জেনে নিজেকে সংশোধন করা। নিজের দোষ সম্পর্কে জানার জন্য কিছু পদক্ষেপ নেয়া যায়। যেমন-

১. আমরা যদি নীতি-নৈতিকতার শিক্ষক বা আলেমগণের শরণাপন্ন হই তবে তাঁরা আমাদের চরিত্রের দোষ-ত্রুটি সম্পর্কে অবহিত করতে পারবেন।

২. নিজের কোন ধর্মপরায়ণ, সত্যবাদী ও জ্ঞানী বন্ধুকে নিজের দোষ-ত্রুটি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা।

৩. শত্রুর মুখ থেকে নিজের দোষ জেনে নেয়া। কেননা, শত্রুরা ছিদ্রান্বেষী হয়ে থাকে। এটি বললে অত্যুক্তি হবে না যে, মানুষ এ ব্যাপারে বন্ধুর তুলনায় ছিদ্রান্বেষী শত্রু দ্বারা অধিক উপকৃত হতে পারে। কেননা, বন্ধু খোশামোদের কারণে দোষ প্রকাশ করে না। কিন্তু এক্ষেত্রে সমস্যার বিষয় হচ্ছে মানুষ জন্মগতভাবে শত্রুর উক্তিকে মিথ্যা ও হিংসাপ্রণোদিত জানে; কিন্ত অন্তর্চক্ষুর অধিকারী ব্যক্তিরা শত্রুর কথা দ্বারা উপকৃত হন।

৪. মানুষের সাথে মেলামেশা করে তাদের মধ্যে যে খারাপ দিকগুলো দেখা যায় সেগুলো নিজের মধ্যে আছে কিনা সেটা নিয়ে চিন্তা করা। কেননা, মুমিনরা পরস্পরের আয়না। তাই অপরের দোষ দেখে তারা নিজেদের দোষ জেনে নেয়। তারা জানে যে, সব মানুষের প্রকৃতি কাছাকাছি হয়ে থাকে। যে দোষ একজনের মধ্যে থাকে, তার মূল অপরের মধ্যে থাকতে পারে।

এভাবে আমরা আমাদের দোষ চিনতে পারব। আমাদের মধ্যে একটি প্রবণতা রয়েছে যে, যদি কেউ আমাদের ভুল ধরিয়ে দেয় তাহলে আমরা তাকে অপছন্দ করা শুরু করি। তাকে নিজের শত্রু বলে মনে করি। এটি মোটেও উচিত নয়। কারণ, অসচ্চরিত্র সাপ বা বিচ্ছুর মত। যদি কেউ আমাদের বলে, তোমার কাপড়ে বিচ্ছু রয়েছে তাতে আমাদের উচিত তার কাছে ঋণী হয়ে ও তার ওপর সন্তুষ্ট হয়ে বিচ্ছুকে কাপড় থেকে আলাদা করে মেরে ফেলা। অথচ কিয়ামতের সেই কঠিন আযাবের মোকাবিলায় একটি বিচ্ছুর কামড় কোন কিছুই না। তাই কেউ আমাদের দোষ ধরিয়ে দিলে তার ওপর আমাদের খুশী হওয়া উচিত। অথচ আমরা খুশী না হয়ে উল্টো সেই

ব্যক্তির দোষ অন্বেষণে উঠেপড়ে লাগি। আমাদের আসলে এমন ব্যক্তিকেই বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করা উচিত। ঐ ব্যক্তিকে নয় যে আমার ভাল-মন্দ প্রতিটি কাজের প্রশংসা করবে।[৩২]

চারিত্রিক ত্রুটি দূর করার উপায়

প্রকৃতপক্ষে চারিত্রিক ত্রুটি-বিচ্যুতি হল এক প্রকার মানসিক রোগ। এ রোগ দূর করার জন্য তিনটি পদক্ষেপ নিতে হবে।

প্রথমত রোগটি কী ধরনের তা নিরূপণ করা। দ্বিতীয়ত রোগের উৎস কোথায় তা নির্ণয় করা। তৃতীয়ত রোগ নিরাময়ের উপায় নির্ধারণ করা।

রোগ নিরাময়ের উপায়

১. ভাল পরিবেশে অবস্থান : পরিবেশের প্রভাবে মানুষ সংশোধিত হতে পারে। মানুষ ভাল পরিবেশ পেলে ভাল হয়ে গড়ে ওঠে আর খারাপ পরিবেশ পেলে উত্তম চরিত্রের ব্যক্তিও পরিবর্তিত হয়ে যায়।

২. সৎ সঙ্গ লাভ : খারাপ সঙ্গ ত্যাগ করে সবসময় সৎ সঙ্গ লাভের জন্য চেষ্টা করতে হবে।

একটি হাদীসে বলা হয়েছে : 'মানুষের দীন তার বন্ধু ও সহগামীর দ্বারাই নির্ধারিত হয়।'

৩. খারাপ পরিবেশ থেকে হিজরত : খারাপ পরিবেশ ছেড়ে ভাল পরিবেশে হিজরত করতে হবে।

পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে :

۞ وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ يَجِدْ فِي ٱلْأَرْضِ مُرَٰغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً

'এবং যে কেউ আল্লাহর পথে হিজরত করবে সে পৃথিবীতে বহু (নিরাপদ) স্থান ও (ধর্মপালন ও কর্মের ক্ষেত্রে) প্রশস্ততা লাভ করবে।'[৩৩]

আমরা ধারাবাহিকভাবে নৈতিক চরিত্রের বেশ কিছু বিষয় নিয়ে আলোচনা রাখার চেষ্টা করব। এ প্রবন্ধে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় কথা বলা বা জিহ্বার ব্যবহার নিয়ে আলোচনা করা হল।

জিহ্বার ব্যবহার বা কথা বলা

কারও পরিধেয় পোশাক থেকে মানুষ হয়ত তার সম্পর্কে মোটামুটি একটি ধারণা পেতে পারে, কিন্তু তার সম্পর্কে তাদের চূড়ান্ত অনুভূতি অর্জিত হবে তার কথা বলা থেকে। তাই কথা বলার সময় সতর্কতা অবলম্বন করা প্রয়োজন। কথা বলা থেকেই মানুষের ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে ধারণা লাভ করা যায়।

আলী (আ.) বলেছেন :

المرء مخبوء تحت لسانه

'মানুষ তার কথার আড়ালে অবস্থান করে।'[৩৪]

আলী (আ.) বলেন, 'হে লোকসকল! মানুষের দশটি গুণ তার জিহ্বা দ্বারা প্রকাশ পায় : ১. সাক্ষী, যে তার ভেতরের বার্তা প্রকাশ করে, ২. বিচারক, যে লোকজনের মধ্যে বিচার করে, ৩. মুখপাত্র, যে উত্তর প্রদান করে, ৪. সুপারিশকারী, যার দ্বারা মনোবাঞ্ছা প্রার্থনা করা হয়, ৫. প্রশংসাকারী, যে সবকিছুকে পরিচয় করিয়ে দেয়, ৬. নির্দেশদানকারী, যে ভাল কাজে নির্দেশ দেয়, ৭. উপদেশদাতা, যে মন্দ থেকে বারণ করে, ৮. সমবেদনা প্রকাশকারী, যা দ্বারা দুঃখ-কষ্টসমূহ সহজ হয়। ৯. প্রশংসিত মাধ্যম, যা দ্বারা বিদ্বেষ দূর হয়, ১০. মনোহর, যা থেকে কানসমূহ পরিতৃপ্তি লাভ করে।'[৩৫]

আমীরুল মুমিনীন হযরত আলী ইবনে আবি তালিব (আ.) কম কথা বলাকে পরিপক্ব বুদ্ধির নিদর্শন বলেছেন। তিনি বলেন :

إذا تمّ العقل نقص الكلام

'যখন আকল পরিপক্ব হবে তখন কথা কমে যাবে।'[৩৬]

আলী (আ.) আরও বলেন, 'জ্ঞানী লোকের জিহ্বা হৃদয়ের পেছনে, আর মূর্খ লোকের হৃদয় জিহ্বার পেছনে।'[৩৭]

মানুষের সবচেয়ে জরুরি বিষয় হল কথা বলা। যদি কথা না বলা হয় তাহলে কোন কাজই সম্ভব নয়। মানুষ যেন তার অনুভূতি অপরের নিকট প্রকাশ করতে পারে, একজন আরেকজনের সাথে ভাবের আদান-প্রদান করতে পারে এজন্যই ভাষা দেয়া হয়েছে। এর মাধ্যমেই মানুষ তার চাওয়া-পাওয়া, তার অভাব-অভিযোগ ব্যক্ত করে। কিন্তু অতি জরুরি এ বিষয়টি সম্পাদনের সময় যদি কোন চিন্তা-ভাবনা করা না হয় তাহলেই যত বিপত্তি ঘটে।

রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন :

إنّ اكثر خطاء يا ابن آدم في لسان

'হে মানব! নিশ্চয়ই অধিকাংশ ভুল তোমাদের জিহ্বায় (কথায়)।'

অন্য একটি হাদীসে বলা হয়েছে : 'যে নীরব থাকল, সে নাজাত পেল।'[৩৮]

কেন এ কথা বলা হয়েছে যে, 'অধিকাংশ ভুল তোমার জিহ্বায়'? কারণ, এর ব্যবহার যেহেতু ব্যাপক তাই এতে ভুলের পরিমাণও ব্যাপক। আর এজন্যই সংযত হয়ে কথা বলার জন্য বা কম কথা বলার জন্যই উৎসাহিত করা হয়েছে। কিন্তু ভাল কাজের জন্য কথা বলাকে উৎসাহিত করা হয়েছে।

রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন :

أخذُن لسانك إلّا من الخير فإنك بذالك تغلب الشيطانَ

'জিহ্বাকে রক্ষা কর ভাল ছাড়া, তাহলে তুমি শয়তানের ওপর বিজয়ী হবে।'

আলী (আ.) বলেন, 'হে লোকসকল! যে ব্যক্তি স্বীয় জিহ্বাকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না, সে অনুতপ্ত হয়।'[৩৯]

ইমাম গাজ্জালী বলেছেন : 'বিশটি গুনাহের কারণ হল কথা বলা। আর এগুলো হল :

১. এমন কোন বিষয়ে কথা বলা যে বিষয়ে জ্ঞান নেই
২. অযথা কথা বলা
৩. কোন বাতিল বিষয় নিয়ে কথা বলা

৪. তর্ক করা
৫. ঝগড়া করা
৬. বানিয়ে বা অতিরঞ্জিত কথা বলা
৭. অশোভন শব্দ উচ্চারণ করা
৮. অভিশাপ দেয়া
৯. হারাম গান বা কবিতা পাঠ
১০. অতিরিক্ত ঠাট্টা করা
১১. ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ ও পরিহাস করা
১২. গোপন কথা ফাঁস করে দেয়া
১৩. মিথ্যা ওয়াদা করা
১৪. মিথ্যা কথা বলা ও মিথ্যা কসম করা
১৫. পরনিন্দা করা
১৬. কথা লাগানো (চোগলখুরী করা)
১৭. নিফাক (দুই রকম কথা বলা)
১৮. অপাত্রের প্রশংসা
১৯. কোন বাছ-বিচার ছাড়া বা হিসাব ছাড়া কথা বলা
২০. এমন কোন বিষয়ে প্রশ্ন করা যা তার নিজের পক্ষে বোঝা সম্ভব নয় অথবা অযথা প্রশ্ন করা

আল্লামা মাকারেম শিরাজী এগুলোর সাথে আরও দশটি বিষয় যোগ করেছেন। সেগুলো হচ্ছে :

১. অপবাদ দেয়া
২. মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়া
৩. আত্মপ্রশংসা করা
৪. অশ্লীল কথা ছড়ানো ও গুজব রটানো
৫. রূঢ় কথা বলা
৬. অযথা পীড়াপীড়ি করা
৭. আক্রমণাত্মক কথা বলা
৮. এমন কারো নিন্দা করা যে নিন্দিত নয়; নন্দিত

৯. অকৃতজ্ঞের মতো কথা বলা
১০. বাতিলের প্রসার করা

শুধু মুখের ভাষা ব্যবহারের মাধ্যমে এতগুলো খারাপ কাজ সংঘটিত হয়। তাই আমাদের কথা বলার ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করার প্রয়োজন রয়েছে।

নীরবতা অবলম্বন

এতে কোন সন্দেহ নেই যে, ভাষা মানুষের জন্য মহান আল্লাহ্ প্রদত্ত বিরাট সম্পদ। ভাষা একের সাথে অন্যের যোগাযোগের মাধ্যম। এটি জ্ঞানের প্রচার ও মানুষকে হেদায়াত করারও মাধ্যম। মহান আল্লাহ্র ভাষার দ্বারা অন্যান্য পশুপাখি হতে মানুষকে পৃথক করেছেন। আল্লাহ্ তা'আলা পবিত্র কুরআনে বলেছেন :

ٱلرَّحۡمَٰنُ ۝١ عَلَّمَ ٱلۡقُرۡءَانَ ۝٢ خَلَقَ ٱلۡإِنسَٰنَ ۝٣ عَلَّمَهُ ٱلۡبَيَانَ ۝٤

'তিনি রহমান, কুরআন শিক্ষা দিয়েছেন, মানুষকে সৃষ্টি করেছেন এবং তাকে কথা বলা শিক্ষা দিয়েছেন।'[৪০]

কিন্তু যদি মানুষ তার ভাষাকে নিরর্থক কথা, মিথ্যা কথা, তর্ক-বিতর্ক করা, গালিগালাজ করা, উপহাস ও বিদ্রূপ করা, গীবত করা, দোষারোপ করা, রটনা করা, প্রভৃতি থেকে সংরক্ষিত না রাখে তাহলে তা বিপর্যয় সৃষ্টি করবে। সেজন্য পণ্ডিতগণ আমাদের কেবল দরকারি ক্ষেত্রে কথা বলার উপদেশ দিয়েছেন, নইলে চুপ থাকতে বলেছেন। আর এজন্যই হাদীসে বলা হয়েছে : 'যে নীরব থাকল, সে নাজাত পেল।'

কথার প্রকারভেদ

উপকারিতা ও অপকারিতার দৃষ্টিকোণ থেকে মানুষের কথাকে চারটি ভাগে ভাগ করা যায়। যথা :

১. সম্পূর্ণ উপকারী কথা
২. সম্পূর্ণ অপকারী কথা

৩. উপকারী ও অপকারীর মিশ্রণ
৪. উপকারী অপকারী কোনটিই নয়।

ওপরের চারটি ক্ষেত্রের তিনটিতে নীরবতা অবলম্বন করার প্রয়োজন রয়েছে। যেক্ষেত্রে আমরা কথা বলব সেক্ষেত্রে আমাদের লক্ষ্য রাখা উচিত যেন আমাদের কথা কপটতা, কৃত্রিমতা ও বাহুল্যকথন দ্বারা কলুষিত না হয়।

ইসলাম নীরবতা অবলম্বনের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছে। মহানবী (সা.) বলেছেন :

رحم الله عبدا تكلم خيرا فَغنِم أو سكت فَسلم

'মহান আল্লাহ্ তাঁর ওই বান্দার ওপর রহম করুন যে ভাল কথা বলে। সে পুরস্কার পাবে। আর যে নীরবতা অবলম্বন করে সে নিরাপদ থাকে।'

ইমাম জাফর সাদিক (আ.) হযরত দাউদ (আ.) সম্পর্কে কথা প্রসঙ্গে বলেন : 'তিনি তাঁর সন্তানকে বলেছিলেন : হে আমার সন্তান! যদি কথা বলাকে রূপার তৈরি বলে বিবেচনা কর, তাহলে নীরবতা সোনার তৈরি।'[৪১]

ইমাম রেজা (আ.) বলেন : 'প্রজ্ঞাবানের বৈশিষ্ট্য হল ধৈর্য, জ্ঞান ও নীরবতা। নীরবতা প্রজ্ঞার অন্যতম দিক। মানুষের ভালবাসা অর্জন ও বেহেশত লাভের জন্য নীরবতা একটি মাধ্যম অথবা প্রতিটি ভাল কাজের কারণ হল নীরবতা।'[৪২]

ইমাম জাফর সাদিক (আ.)-এর নিকট থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, 'নীরবতা হল পণ্ডিতদের মূলমন্ত্র। এটি তাদের মূলমন্ত্র যারা অতীত মানুষের জীবন নিয়ে গবেষণা করে এবং যথাযথ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়। নীরবতা ইহকালে ও পরকালে উভয় জগতের সুখের চাবিকাঠি। এটি ভুলের প্রতিষেধক। মহান আল্লাহ্ একে অজ্ঞের জন্য চাদর এবং জ্ঞানীর জন্য অলংকার করেছেন।'

তিনি আরও বলেন : '...তুমি তোমার মুখ বন্ধ রাখ যতটা সম্ভব, বিশেষ করে যখন তুমি আল্লাহ্ সম্পর্কে কথা বল যা আলোচনা করার জন্য উপযুক্ত শ্রোতা না পাও। এটি বলা হয় হয় যে, রবী ইবনে খাশিম সবসময় একখণ্ড কাগজ তাঁর সামনে রাখতেন এবং সারাদিন যেসব কথা তিনি বলতেন সেগুলো সেখানে লিখতেন। রাত্রিবেলা তিনি এগুলো সতর্কতার সাথে মূল্যায়ন করতেন। তারপর তিনি বলতেন :

যে নীরব ছিল সে এখন নিরাপদ। মহানবী (সা.)-এর কিছু সংখ্যক সাহাবী তাঁদের মুখের মধ্যে পাথর পুরে রাখতেন। তাঁরা এগুলো তাঁদের মুখ থেকে তখনই বের করতেন যখন তাঁরা মহান আল্লাহ্‌র কথা বলতেন এবং আল্লাহ্‌র জন্যই কথা বলতেন।'[৪৩]

সুতরাং নীরবতা ও কথা বলা যথাক্রমে মানুষের মুক্তি ও ধ্বংসের কারণ হতে পারে।

তবে কথা বলা ও নীরব থাকারও ক্ষেত্র রয়েছে। যেখানে কথা বলা প্রয়োজন সেখানে চুপ থাকা উচিত নয় এবং যেখানে চুপ থাকা প্রয়োজন সেখানে কথা বলা ঠিক নয়। ইরানের বিখ্যাত কবি আমীর খসরু তাঁর একটি কবিতায় বলেছেন :

'প্রতিটি কথা বলার মুহূর্ত সুখকর
কিন্তু কখনও কখনও নীরবতা আরও মধুর
মুখ বন্ধ রাখা যেন দুশ্চিন্তার দরজা বন্ধ করা,
কারণ, এ পৃথিবী ভাল ও মন্দের গর্ভধারিণী।
কথা বলার জন্য অনুতাপকারী অনেককে আমি দেখেছি
কিন্তু নীরব থাকার জন্য কাউকে অনুতাপ করতে দেখিনি।
বলার চেয়ে শোনা ভাল যদি তুমি চিন্তা কর
দ্বিতীয়টি করে শূন্য যেথায়, প্রথমটি করে পূর্ণ।
যতক্ষণ না তুমি তোমার বক্তব্যের উপযুক্ততা সম্পর্কে হচ্ছ সুনিশ্চিত
কথা বলার জন্য মুখ খোলা নয় কো তোমার উচিত।'

ইমাম যায়নুল আবেদীন (আ.)-কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল : 'নীরবতা ও কথা বলার মধ্যে কোন্‌টি উত্তম।' তিনি জবাব দিয়েছিলেন : 'কথা বলা ও নিশ্চুপ থাকা– উভয়েরই বিশেষ বিশেষ বিপর্যয়কর ক্ষেত্র রয়েছে। কথা বলা নীরব থাকার চেয়ে উত্তম যদি বক্তা তার কথা বলার পর নিরাপদ থাকে।' তারা জিজ্ঞাসা করল : 'কীভাবে এটি সম্ভব?' তিনি বললেন : 'মহান আল্লাহ্‌ তাঁর নবী ও মহৎ ব্যক্তিদের নীরব থাকার জন্য প্রেরণ করেননি। তিনি তাঁদের ভাষা ব্যবহারের জন্য প্রেরণ করেছিলেন এবং মানুষ কেবল নীরব থাকার জন্য বেহেশতে প্রবেশ করবে না। আল্লাহ্‌র সার্বভৌম ক্ষমতাও নীরবতার মাধ্যমে বাস্তবায়িত হবে না। নীরবতা দ্বারা আগুন নেভানো যায় না। এসব কাজ কেবল কথা বলার মাধ্যমেই সম্ভব। আমি সূর্যকে চাঁদের সমান বিবেচনা করব না।'[৪৪]

অধিক কথা বলা বা বাচালতা

স্বাভাবিকভাবেই যে ব্যক্তি বেশি কথা বলে সে সারাদিন কী কথা বলল তার মূল্যায়ন করার জন্য যথেষ্ট সময় পায় না। আর এজন্যই তার কথা ভিত্তিহীন ও ভুল হয়। শ্রোতারা বিরক্ত হয় এবং বক্তা তার কথার বলিষ্ঠতা হারায়।

ইমাম আলী (আ.) এ ব্যাপারে বলেছেন : 'অধিক কথা বলা একজন জ্ঞানী ব্যক্তিকে বিপথগামী করতে পারে এবং একজন ধৈর্যশীল ব্যক্তিকে হতাশাগ্রস্ত করে। সুতরাং অধিক কথা বল না, তাহলে তুমি যেমন মানুষকে পীড়া দেবে তেমনি মানুষও তোমাকে অসম্মান করবে।'[৪৫]

তিনি আরও বলেন : 'বাচালতা পরিহার কর। কারণ, তা তোমার ভুল ও একগুঁয়েমি বৃদ্ধি করে।'[৪৬]

হযরত ঈসা (আ.) বলেছেন : 'তোমার কথাকে সোনার মত (মূল্যবান) মনে করবে এবং কথা বলার উপযুক্ত সময় বেছে নেবে যেমন তুমি তোমার সোনা ব্যয়ের জন্য উপযুক্ত জিনিসকে বেছে নাও।'

সুতরাং আমাদের অধিক কথা বলা পরিহার করতে হবে। আর কথা বলার সময় এ বিষয়গুলোর প্রতি অবশ্যই লক্ষ্য রাখতে হবে : সব সময় উপকারী ও সত্য কথা বলতে হবে এবং সে কথাই বলা প্রয়োজন যা অন্যের জন্য ক্ষতিকর নয়; কারও মনে আঘাত দিয়ে কোন কথা না বলা, এমনকি ঠাট্টাচ্ছলেও কারও অনুভূতিতে আঘাত না করা; পশ্চাতে কারও নিন্দা না করা; যারা অপরের নিন্দা করে তাদের কথা না শোনা; কখনও গালি-গালাজ না করা এবং যে ক্ষেত্রে বোঝা যাচ্ছে না যে, কথা বলা উচিত কিনা, সেক্ষেত্রে নিশ্চুপ থাকাই কল্যাণকর। যদি কেউ কোন কথা বলে, তা ভাল-মন্দ যা-ই হোক না কেন, কখনই উদ্ধতভাবে জবাব দেয়া উচিত নয়; বরং তাকে তা বুঝিয়ে বলতে হবে।

(চলবে)

তথ্যসূত্র

১. ওয়াসায়েল, ২য় খণ্ড, পৃ. ২২১
২. আধুনিক প্রকাশনী কর্তৃক প্রকাশিত সহীহ আল বুখারী, ৫ম খণ্ড, হাদীস নং ৫৫৯৪

৩. প্রাগুক্ত, হাদীস নং ৫৬০০
৪. তুহাফুল উকুল
৫. তুহাফুল উকুল
৬. মমতাজ বেগম কর্তৃক প্রকাশিত, জেহাদুল ইসলাম কর্তৃক অনূদিত নাহজ আল-বালাঘা, সংক্ষিপ্ত জ্ঞানগর্ভমূলক বাণী নং ১০
৭. নাহজ আল ফাসাহা, পৃ. ৩৩১
৮. আধুনিক প্রকাশনী কর্তৃক প্রকাশিত সহীহ আল বুখারী, ৫ম খণ্ড, হাদীস নং ৫৬৯১
৯. আধুনিক প্রকাশনী কর্তৃক প্রকাশিত সুনান ইবনে মাজা, ৪র্থ খণ্ড, হাদীস নং ৩৬৮৯
১০. প্রাগুক্ত, হাদীস নং ৩৬৮৭
১১. প্রাগুক্ত, ৪র্থ খণ্ড, হাদীস নং ৩৭১৬
১২. বিহারুল আনওয়ার, ১৮তম খণ্ড, ৪র্থ অধ্যায়, হাদীস নং ২
১৩. প্রাগুক্ত, ৭৫তম খণ্ড, ৫১তম অধ্যায়, হাদীস নং ১১
১৪. ডন পাবলিকেশন্স কর্তৃক প্রকাশিত আল্লামা সাইয়্যেদ মুসাভী লারী প্রণীত আত্মসংশোধন ও সমাজ সংশোধনের কর্মপন্থা, পৃ. ২৫
১৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬
১৬. ওয়াসায়েল, ২য় খণ্ড, পৃ. ২০১
১৭. তুহাফুল উকুল
১৮. সূরা হা-মীম আস্-সাজদা : ৩৪
১৯. সূরা আলে ইমরান : ১৩৫
২০. আল্লামা শেখ মুফিদ প্রণীত কিতাবুল ইরশাদ, পৃ. ২৫৭
২১. সূরা মুমিনূন : ১-৬
২২. সূরা তাওবা : ১১২
২৩. সূরা ফুরকান : ৬৩-৬৮
২৪. আধুনিক প্রকাশনী কর্তৃক প্রকাশিত সহীহ আল বুখারী, ৫ম খণ্ড, হাদীস নং ৫৬৯৯
২৫. সূরা আলে ইমরান : ১৫৯
২৬. সূরা আহযাব : ২১
২৭. ইসলামিক ফাউন্ডেশন কর্তৃক প্রকাশিত মুয়াত্তা ইমাম মালিক, ২য় খণ্ড, রেওয়ায়েত নং ৮
২৮. সূরা হাশর : ৭
২৯. ফাযায়েলে খামসাহ্, ১ম খণ্ড, পৃ. ১১৯
৩০. সূরা কালাম : ৪
৩১. মদীনা পাবলিকেশান্স কর্তৃক প্রকাশিত, ইমাম গায্যালী প্রণীত এহইয়াউ উলুমিদ্দীন, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২৬৫-২৭২

৩২. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫৭-২৫৯
৩৩. সূরা নিসা : ১০০
৩৪. মমতাজ বেগম কর্তৃক প্রকাশিত, জেহাদুল ইসলাম কর্তৃক অনূদিত নাহজ আল-বালাঘা, সংক্ষিপ্ত জ্ঞানগর্ভমূলক বাণী নং ১৪৮
৩৫. তুহাফুল উকুল
৩৬. মমতাজ বেগম কর্তৃক প্রকাশিত, জেহাদুল ইসলাম কর্তৃক অনূদিত নাহজ আল-বালাঘা, সংক্ষিপ্ত জ্ঞানগর্ভমূলক বাণী নং ৭১
৩৭. প্রাগুক্ত, বাণী নং ৪০
৩৮. বিহারুল আনওয়ার, ৭৭তম খণ্ড
৩৯. তুহাফুল উকুল
৪০. সূরা রহমান : ১-৪
৪১. উসূলে কাফী, ২য় খণ্ড, পৃ. ১১৪
৪২. প্রাগুক্ত
৪৩. মিসবাহুশ শারীয়াহ
৪৪. বিহারুল আনওয়ার, ৭১তম খণ্ড, পৃ. ২৭৪
৪৫. গুরারুল হিকাম
৪৬. প্রাগুক্ত

সত্যের প্রথম প্রকাশ

আয়াতুল্লাহ্ জাফর সুবহানী

ইসলামের প্রকৃত ইতিহাসের শুভ সূচনা ঐ দিন থেকে হয়েছিল যেদিন মহানবী (সা.) রিসালাত ও নবুওয়াতের দায়িত্ব লাভ করেন। এর ফলে অনেক স্মরণীয় ঘটনার উদ্ভব হয়। যেদিন মহানবী মানব জাতির হেদায়াতের দায়িত্বপ্রাপ্ত হলেন এবং ওহীর ফেরেশতার মাধ্যমে إنك لرسول الله 'নিশ্চয়ই আপনি আল্লাহ্র রাসূল'– এ আহ্বানধ্বনি শুনতে পেলেন সেদিন তিনি এক গুরুদায়িত্ব গ্রহণ করলেন যা অন্যান্য নবী-রাসূলও গ্রহণ করেছিলেন। ঐ দিন কুরাইশদের কাছে 'আল আমীন' (বিশ্বস্ত) উপাধিতে ভূষিত হযরত মুহাম্মাদ (সা.)-এর নীতি এবং তাঁর মিশনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অধিকতর স্পষ্ট হয়ে গেল।

হিরা পর্বতে মহানবী (সা.)

হিরা পর্বত পবিত্র মক্কা নগরীর উত্তরে অবস্থিত। আধা ঘণ্টার ব্যবধানে এ পর্বতের শৃঙ্গে আরোহণ করা যায়। বাহ্যত এ পর্বত কৃষ্ণ প্রস্তর দ্বারা গঠিত এবং জীবনের সামান্যতম চিহ্নও এ পর্বতে দৃষ্টিগোচর হয় না। এ পর্বতের উত্তরাংশে একটি গুহা আছে। অনেক পাথর অতিক্রম করে অবশেষে সেখানে পৌঁছানো যায়। এ গুহার উচ্চতা একজন মানুষের উচ্চতার সমান। এ গুহার একটি অংশ সূর্যের আলোয় আলোকিত হয় এবং অন্যান্য অংশ সব সময় অন্ধকারাচ্ছন্ন থাকে।

কিন্তু এ গুহাই এমন সব (ঐতিহাসিক) ঘটনার সাক্ষী যে, আজও ঐ গুহার অব্যক্ত ভাষা থেকে এসব ঘটনা শোনার তীব্র আকর্ষণ মানুষকে এ গুহার কাছে টেনে নিয়ে যায় এবং প্রচুর কষ্ট করে আগ্রহী দর্শনার্থীরা এ গুহার দ্বারপ্রান্তে পৌঁছতে সক্ষম হয়। এ গুহায় পৌঁছেই মানুষ ওহী অবতীর্ণ হওয়ার মহাঘটনা এবং বিশ্ব মানবতার মহান নেতা হযরত মুহাম্মাদ (সা.)-এর জীবনের অতি গুরুত্বপূর্ণ একটি অংশ জানার আগ্রহ প্রকাশ করে। গুহাটি যেন তার অব্যক্ত ভাষায় বলতে থাকে : এ স্থানটি কুরাইশ বংশের সর্বাধিক প্রিয় ব্যক্তির ইবাদাতগাহ্। তিনি নবুওয়াতের সুমহান মর্যাদায় সমাসীন হবার আগে বেশ কিছু দিন এখানে অতিবাহিত করেছিলেন। তিনি এ স্থানটি ইবাদাত-বন্দেগী করার জন্য মনোনীত করেছিলেন যা ছিল নগর জীবনের সকল কোলাহল থেকে মুক্ত। তিনি পুরো রমযান মাস এখানেই কাটাতেন। অন্যান্য মাসেও তিনি কখনও কখনও এখানে অবস্থান করতেন।

নবুওয়াতের মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হবার আগে মহানবী (সা.) দু'টি বিষয়ে সবচেয়ে বেশি ভাবতেন। বিষয় দু'টি ছিল :

১. তিনি পৃথিবী ও আকাশে বিদ্যমান ঐশ্বরিক শক্তি ও মহিমা নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করতেন। তিনি প্রতিটি সৃষ্ট অস্তিত্ববান সত্তার মুখাবয়বে মহান আল্লাহ্র নূর (আলো) এবং তাঁর সীমাহীন ক্ষমতা ও জ্ঞান প্রত্যক্ষ করতেন। আর এ পথেই অবস্তুগত ঊর্ধ্বলোক ও আধ্যাত্মিক জগতের প্রবেশদ্বারসমূহ তাঁর সামনে উন্মুক্ত হয়ে যেত।

২. যে গুরুদায়িত্ব তাঁর কাছে অর্পণ করা হবে সে ব্যাপারেও তিনি চিন্তা করতেন। এতসব নৈতিক অধঃপতন, বিশৃঙ্খলা ও ফিতনা-ফাসাদ থাকা সত্ত্বেও তাঁর দৃষ্টিতে তৎকালীন সমাজের সংস্কার ও সংশোধন কোন অসম্ভব কাজ বলে গণ্য হয়নি। তবে সঠিক সংস্কারমূলক কর্মসূচি ও পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করাও ছিল দুরূহ। এ দৃষ্টিকোণ থেকেই তিনি মক্কাবাসীর পাপাচার ও বিলাসবহুল জীবনকে দেখেছেন এবং তাদের সংশোধন প্রক্রিয়ার ব্যাপারেও গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করেছেন।

তিনি নিষ্প্রাণ ইচ্ছাশক্তিহীন প্রতিমাসমূহের সামনে মক্কাবাসীর নতজানু হওয়া ও উপাসনা করার দৃশ্য দেখে খুবই মর্মাহত হতেন এবং তাঁর পবিত্র মুখমণ্ডলে এ ব্যাপারে তীব্র অসন্তোষ ও ক্ষোভের চিহ্ন স্পষ্টরূপে ফুটে উঠত। কিন্তু যেহেতু তাঁকে জনসমক্ষে সত্য প্রকাশ করার অনুমতি তখনও দেয়া হয়নি সেজন্য তিনি তা প্রকাশ্যে বর্ণনা করা থেকে বিরত থেকেছেন।

ওহী অবতরণের শুভ সূচনা

মহান আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে একজন ফেরেশতা সৌভাগ্য ও হেদায়াতের গ্রন্থের (আল কুরআন) শুভ সূচনা হিসাবে কয়েকটি আয়াত মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সা.)-এর কাছে পাঠ করেন। আর এ কয়েকটি আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার মধ্য দিয়ে তিনি নবুওয়াতের মর্যাদাপূর্ণ স্থানে অধিষ্ঠিত হলেন অর্থাৎ এ ঘটনার মধ্য দিয়ে মহান আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে হযরত মুহাম্মাদ (সা.)-এর নবুওয়াত আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করা হল। ঐ ফেরেশতা ছিলেন হযরত জিবরীল (আ.)। আর দিনটি ছিল মহানবী (সা.)-এর নবুওয়াতের অভিষেক (মাবআ'স) দিবস।

দীর্ঘদিন তাঁর জীবনের সর্বোৎকৃষ্ট ও সবচেয়ে উপভোগ্য মুহূর্তগুলো ছিল হিরা গুহায় নির্জনবাস ও ইবাদাত-বন্দেগীর মুহূর্ত। এ অবস্থার মধ্য দিয়ে তাঁর সময় অতিবাহিত হচ্ছিল। অবশেষে এক বিশেষ দিবসে এক ফেরেশতা একটি ফলকসহ অবতীর্ণ হয়ে ঐ ফলকটি তাঁর সামনে তুলে ধরে বলেছিলেন, 'পড়ুন।' যেহেতু তিনি উম্মী (নিরক্ষর) ছিলেন এবং কখনই কোন বই পাঠ করেননি সেহেতু তিনি বলেছিলেন, 'আমি তো পড়তে পারি না।' ওহী বহনকারী ফেরেশতা তাঁকে জড়িয়ে ধরে খুব শক্তভাবে চাপ দিলেন। এরপর তাঁকে পুনরায় পড়তে বললে তিনি ঐ একই উত্তর দিয়েছিলেন। ঐ ফেরেশতা পুনরায় তাঁকে জড়িয়ে ধরে শক্তভাবে চাপ দেন। এভাবে তিন বার চাপ দেয়ার পর মহানবী (সা.) নিজের মধ্যে অনুভব করলেন যে, ফেরেশতার হাতে যে ফলকটি আছে তা তিনি পড়তে পারছেন। এ সময় তিনি ঐ আয়াতসমূহ পাঠ করলেন যা ছিল বাস্তবে মানব জাতির সৌভাগ্যদানকারী গ্রন্থের অবতরণিকাস্বরূপ। নিচে আয়াতগুলো উল্লেখ করা হল :

ٱقْرَأْ بِٱسْمِ رَبِّكَ ٱلَّذِى خَلَقَ ﴿١﴾ خَلَقَ ٱلْإِنسَـٰنَ مِنْ عَلَقٍ ﴿٢﴾ ٱقْرَأْ وَرَبُّكَ
ٱلْأَكْرَمُ ﴿٣﴾ ٱلَّذِى عَلَّمَ بِٱلْقَلَمِ ﴿٤﴾ عَلَّمَ ٱلْإِنسَـٰنَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ﴿٥﴾

'পড় তোমার প্রভুর নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন। সৃষ্টি করেছেন মানুষকে এক বিন্দু জমাট রক্ত থেকে। পড়, আর তোমার প্রভু মহান (অত্যন্ত সম্মানিত)। যিনি কলম দ্বারা শিক্ষা দিয়েছেন। মানুষ যা জানত না তা তিনি তাকে শিক্ষা দিয়েছেন।'[১]

জিবরীল (আ.) স্বীয় দায়িত্ব পালন করলেন। আর মহানবীও ওহী অবতীর্ণ হবার পর হিরা পর্বত থেকে নিচে নেমে আসলেন এবং হযরত খাদীজার ঘরের দিকে রওনা হলেন।[২]

উপরিউক্ত আয়াতসমূহ মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সা.)-এর সংক্ষিপ্ত কর্মসূচি ও পরিকল্পনা স্পষ্ট করে দেয় এবং প্রমাণ করে যে, তাঁর ধর্মের মূল ভিতই হচ্ছে অধ্যয়ন, জ্ঞান-বিজ্ঞান ও কলমের ব্যবহার।

মিথ্যা কল্প-কাহিনীসমূহ

যেসব ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব বিশ্বজনীন ঐতিহাসিক ও জীবনী রচয়িতাগণ যতদূর সম্ভব তাঁদের জীবনী গ্রন্থাকারে লিখে সংরক্ষণ করার প্রয়াস চালিয়েছেন। এমনকি তাঁদের রচনা পূর্ণ করার জন্য তাঁরা বিভিন্ন স্থান সফর করেছেন। মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সা.)-এর মত আর কোন ব্যক্তিত্বের সন্ধান পাওয়া যাবে না ইতিহাসে যার জীবনের যাবতীয় বিশেষত্ব ও খুঁটিনাটি দিক লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। তাঁর সাহাবিগণ তাঁর জীবনের সমুদয় খুঁটিনাটি দিক ও ঘটনা যত্নসহকারে লিপিবদ্ধ ও সংরক্ষণ করেছেন।

এই অনুরাগ, আকর্ষণ ও ভালবাসা যেমন মহানবীর জীবনের যাবতীয় বিষয় সংরক্ষণ করার ক্ষেত্রে সাহায্য করেছে তদ্রূপ তা কখনও কখনও তাঁর জীবনী গ্রন্থে বাড়তি অলংকার (যা ভিত্তিহীন) সংযোজনের কারণও হয়েছে। অবশ্য এসব কাজ যেখানে অজ্ঞ বন্ধুদের দ্বারা সম্পন্ন হওয়া অসম্ভব নয়, সেখানে জ্ঞানী শত্রুদের দ্বারাও সম্পন্ন হওয়া অসম্ভব নয়। এ কারণেই কোন মনীষীর জীবনী রচয়িতার ওপর অত্যাবশ্যকীয় দায়িত্ব হচ্ছে ঐ মনীষী বা ব্যক্তিত্বের জীবনের ঘটনাবলি বিশ্লেষণ করার ক্ষেত্রে পর্যাপ্ত সতর্কতা অবলম্বন এবং সূক্ষ্ম ঐতিহাসিক মানদণ্ডে তাঁর জীবনের ঘটনাসমূহ যাচাই বাছাই করার ক্ষেত্রে উদাসীনতা পরিহার। এখন আমরা ওহী নাযিল হবার পরবর্তী ঘটনাসমূহের প্রতি দৃষ্টিপাত করছি।

মহানবী (সা.)-এর মহান আত্মা ওহীর আলোয় আলোকিত হয়ে যায়। ওহীর ফেরেশতা যা কিছু তাঁকে শিখিয়েছিলেন তা তাঁর হৃদয়ে সুগ্রথিত হয়ে যায়। এ ঘটনার পর ঐ ফেরেশতাই তাঁকে সম্বোধন করে বলেছিলেন, 'হে মুহাম্মাদ! আপনি মহান আল্লাহ্‌র রাসূল (প্রেরিত দূত)। আর আমি জিবরীল।' কখনও কখনও বলা হয়

যে, তিনি এ আহ্বান ঐ সময় শুনতে পেয়েছিলেন যখন তিনি হিরা পর্বত থেকে নিচে নেমে এসেছিলেন।

যা হোক, তিনি যখন (হিরা পর্বত থেকে ফিরে) ঘরে প্রবেশ করলেন তখন তাঁর স্ত্রী (খাদীজা) তাঁর পবিত্র মুখমণ্ডলে অস্থিরতা ও গভীর চিন্তার ছাপ প্রত্যক্ষ করলেন। তিনি মহানবীর কাছে এর কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। হিরা পর্বতের গুহায় যা ঘটেছিল মহানবী তা হযরত খাদীজার কাছে বর্ণনা করলেন। হযরত খাদীজা ভক্তিসহকারে তাঁর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'মহান আল্লাহ্ আপনাকে সাহায্য করুন।'

এরপর মহানবী (সা.) ক্লান্তি অনুভব করে খাদীজাকে বললেন, دثّريني 'আমাকে ঢেকে দাও।' হযরত খাদীজা তাঁকে ঢেকে দিলেন এবং তিনি কিছুক্ষণ ঘুমালেন।

হযরত খাদীজা ওয়ারাকাহ্ ইবনে নওফেলের কাছে গেলেন। তিনি আরবের অন্যতম জ্ঞানী ব্যক্তি ছিলেন। ইঞ্জিল পড়ার পর বেশ কিছুদিন ধরে তিনি খ্রিস্টধর্ম পালন করছিলেন। তিনি হযরত খাদীজার চাচাত ভাই ছিলেন। হযরত খাদীজা মহানবীর কাছ থেকে যা শুনেছিলেন তা তাঁর কাছে হুবহু বর্ণনা করলেন। ওয়ারাকাহ্ চাচাত বোনের কথা শোনার পর বলেছিলেন, 'তোমার চাচার ছেলে (মহানবী) সত্য বলেছেন। যা তাঁর ক্ষেত্রে ঘটেছে আসলে তা নবুওয়াতের শুভ সূচনা মাত্র...।'

যা কিছু এখন আপনাদের কাছে বর্ণনা করা হল তা মুতাওয়াতির (অকাট্য সূত্রে বর্ণিত) ঐতিহাসিক বিবরণসমূহেরই সার সংক্ষেপ যা সকল গ্রন্থেই লিপিবদ্ধ হয়েছে। তবে এসব বর্ণনার ফাঁকে ফাঁকে এমন কিছু বিষয় দৃষ্টিগোচর হয় যা মহান নবীদের ব্যাপারে আমাদের জ্ঞানের সাথে মোটেও খাপ খায় না। এখন আমরা আপনাদের সামনে যা বর্ণনা করব তা আসলে অলীক কল্পকাহিনী ছাড়া আর কিছুই নয়।

আমরা প্রখ্যাত মিশরীয় সাহিত্যিক ও লেখক ড. হাইকালের লেখা থেকে সবচেয়ে বেশি আশ্চর্যান্বিত হয়েছি। কারণ, তিনি তাঁর গ্রন্থের ভূমিকায় যে দীর্ঘ বক্তব্য দিয়েছেন সেখানে বলেছেন যে, একদল লোক শত্রুতা বা বন্ধুত্ববশত মহানবীর জীবনচরিত রচনা করার ক্ষেত্রে অনেক মিথ্যার অনুপ্রবেশ ঘটিয়েছে। কিন্তু তিনি নিজেই এ স্থলে এসে এমন সব বিষয় বর্ণনা করেছেন যা নিশ্চিতভাবে ভিত্তিহীন, অথচ মরহুম আল্লামা তাবারসীর মত কতিপয় আলেম এ ব্যাপারে বেশ কিছু উপকারী বিষয়

স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন।[৩] এখন সেসব মিথ্যা ও ভিত্তিহীন কল্প-কাহিনীর কিয়দংশ উল্লেখ করা হল :

১. যখন মহানবী (সা.) হযরত খাদীজার ঘরে প্রবেশ করলেন তখন তিনি চিন্তা করছিলেন যে, তিনি যা দেখেছেন সে ব্যাপারে কি তিনি ভুল করেছেন অথবা তিনি কি জাদুগ্রস্ত হয়ে গিয়েছেন! 'আপনি সব সময় অনাথদের আদর-যত্ন করতেন এবং নিজ আত্মীয়-স্বজন ও জ্ঞাতি-গোত্রের সাথে সদাচরণ করতেন'– এ কথা বলার মাধ্যমে হযরত খাদীজা তাঁর অন্তর থেকে সব ধরনের সন্দেহ ও সংশয় দূর করে দিলেন। তাই মহানবী তাঁর দিকে একজন কৃতজ্ঞ ব্যক্তির ন্যায় তাকিয়ে একটি কম্বল এনে তাঁকে ঢেকে দিতে বললেন।[৪]

২. তাবারী ও অন্যান্য ঐতিহাসিক লিখেছেন, 'মহানবী (সা.) যখন إنك لرسول الله 'নিশ্চয়ই আপনি মহান আল্লাহ্‌র রাসূল'– এ আহ্বান শুনতে পেলেন তখন তাঁর সমস্ত দেহ কাঁপতে লাগল। তিনি পাহাড় থেকে নিচে লাফিয়ে পড়ার সিদ্ধান্তও নিয়ে ফেললেন। অতঃপর ফেরেশতা তাঁর সামনে আবির্ভূত হয়ে তাঁকে এ কাজ করা থেকে বিরত রাখলেন।'[৫]

৩. ঐ দিবসের পরে হযরত মুহাম্মাদ (সা.) পবিত্র কা'বা তাওয়াফ করতে গেলেন। ওয়ারাকাহ্‌ ইবনে নওফেলকে দেখে তাঁর কাছে তিনি নিজের এ ঘটনা বর্ণনা করলেন। ওয়ারাকাহ্‌ তা শুনে বলেছিলেন, 'মহান আল্লাহ্‌র শপথ, আপনি এ জাতির নবী। আর প্রধান ফেরেশতা যিনি হযরত মূসা (আ.)-এর কাছে আসতেন তিনিই আপনার ওপর অবতীর্ণ হয়েছেন। কতিপয় লোক আপনাকে প্রত্যাখ্যান করবে, আপনাকে অনেক কষ্ট ও যাতনা দেবে, আপনাকে আপনার শহর (মক্কা) থেকে বহিষ্কার করবে এবং আপনার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে।' তখন হযরত মুহাম্মাদ (সা.) অনুভব করলেন যে, ওয়ারাকাহ্‌ সত্য কথা বলছেন।[৬]

বর্ণনার অসারত্ব ও ভিত্তিহীনতা

আমরা বিশ্বাস করি যে, এসব ঘটনা যা ইতিহাস ও তাফসীরে বর্ণিত হয়েছে তার সবই ভিত্তিহীন, বানোয়াট ও মিথ্যা।

প্রথমত এসব বক্তব্য মূল্যায়ন করার জন্য আমাদের উচিত অতীতের মহান নবী-রাসূলগণের জীবনেতিহাসের দিকে দৃষ্টি দেয়া। পবিত্র কুরআনে তাঁদের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে এবং তাঁদের পবিত্র জীবনের বর্ণনাসহ প্রচুর বিশুদ্ধ রেওয়ায়েত ও হাদীস বর্ণিত হয়েছে। আমরা তাঁদের মধ্য থেকে কোন একজনের জীবনেও এ ধরনের অমর্যাদাকর ঘটনা দেখতে পাই না। পবিত্র কুরআনে হযরত মূসা (আ.)-এর ওপর ওহী অবতীর্ণ হওয়ার সূচনা সংক্রান্ত পূর্ণ বিবরণ এসেছে এবং তাঁর জীবনেতিহাসের সকল বৈশিষ্ট্য স্পষ্টভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। আর কখনই ঐ ধরনের ভয়-ভীতি ও অস্থিরতার কথা উল্লেখ করা হয়নি যার ফলে ওহী অবতীর্ণ হওয়ার সময় তিনি আত্মহত্যা করার সিদ্ধান্ত নেবেন। অথচ মূসা (আ.)-এর জন্য ভয় পাওয়ার প্রেক্ষাপট ঢের বেশি ছিল। কারণ, আঁধার রাতে নির্জন মরু-প্রান্তরে তিনি একটি বৃক্ষ থেকে আহ্বান শুনতে পেয়েছিলেন এবং এভাবেই তাঁর নবুওয়াত ও রিসালাতের ঘোষণা দেয়া হয়েছিল।

পবিত্র কুরআনের বক্তব্য অনুযায়ী হযরত মূসা (আ.) এ সময় তাঁর স্থিরতা বজায় রেখেছিলেন। তাই মহান আল্লাহ্ যখন তাঁকে সম্বোধন করে বললেন, 'হে মূসা! তোমার লাঠি নিক্ষেপ কর', তিনি তৎক্ষণাৎ তা নিক্ষেপ করেছিলেন। মূসা (আ.)-এর ভয় ছিল লাঠিটির দিক থেকে যা একটি বিপজ্জনক প্রাণীতে পরিণত হয়েছিল। তাহলে কি বলা যায় যে, ওহী অবতরণের শুভ সূচনালগ্নে মূসা (আ.) শান্ত ও ধীরস্থির ছিলেন, অথচ যে ব্যক্তি সকল নবী ও রাসূলের চেয়ে শ্রেষ্ঠ তিনি ওহীর ফেরেশতার বাণী শুনে এতটা অস্থির হয়ে পড়েছিলেন যে, পাহাড়ের ওপর থেকে নিচে লাফিয়ে আত্মহত্যা করতে চেয়েছিলেন? এ কথা কি যুক্তিসংগত?

নিঃসন্দেহে যতক্ষণ পর্যন্ত নবীর আত্মা যে কোন দিক থেকে মহান আল্লাহ্র ঐশী রহস্য গ্রহণ করার জন্য উপযুক্ত না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত প্রজ্ঞাময় আল্লাহ্ তাঁকে নবুওয়াতের মাকামে অধিষ্ঠিত করবেন না। কারণ, মহান নবিগণের প্রেরণের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হচ্ছে জনগণকে সুপথ প্রদর্শন। যে ব্যক্তির আত্মিক (আধ্যাত্মিক) শক্তি এতটুকু যে, ওহী শোনামাত্রই আত্মহত্যা করতে প্রস্তুত হয়ে যান তাহলে তিনি কীভাবে জনগণের মধ্যে প্রভাব বিস্তার করবেন?

দ্বিতীয়ত এটা কীভাবে সম্ভব যে, মূসা (আ.) মহান আল্লাহ্র ঐশী আহ্বান শুনে নিশ্চিত হয়েছিলেন যে, তা মহান আল্লাহ্র পক্ষ থেকে এবং তৎক্ষণাৎ তিনি মহান

আল্লাহ্‌র কাছে প্রার্থনা করেছিলেন তিনি যেন তাঁর ভাই হারুনকে তাঁর সহকারী নিযুক্ত করেন? কারণ, হারুন (আ.) তাঁর চেয়ে অধিকতর প্রাঞ্জলভাষী ও বাকপটু[৭]; অথচ নবীদের নেতা দীর্ঘক্ষণ সন্দেহ ও সংশয়ের মধ্যেই থেকে যান। যখন ওয়ারাকাহ্ ইবনে নওফেল তাঁর অন্তঃকরণ থেকে সন্দেহ-সংশয়ের ধুলো দূর করে দেন তখন তা দূরীভূত হয়ে যায়।

তৃতীয়ত নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে, ওয়ারাকাহ্ খ্রিস্টধর্মাবলম্বী ছিলেন। যখন তিনি মহানবীর অস্থিরতা ও সন্দেহ-সংশয় দূর করতে চাইলেন তখন তিনি কেবল মূসা (আ.)-এর নবুওয়াত প্রাপ্তির ঘটনা উল্লেখ করে বলেছিলেন, 'এটা এমনই এক পদ যা হযরত মূসাকে দেয়া হয়েছিল।'[৮]

তাহলে এ থেকে কি প্রমাণিত হয় না যে, জালকারী ইয়াহুদী চক্র এ ক্ষেত্রে সক্রিয় ছিল এবং তারা গল্পের নায়ক ওয়ারাকার ধর্ম সম্পর্কে অমনোযোগী থেকে গিয়েছে এবং এ ধরনের উপাখ্যান তৈরি করেছে?

এ ছাড়াও মহানবীর যে মহত্ত্ব ও উচ্চ মর্যাদার কথা আমরা জানি, এ ধরনের কার্যকলাপ তার সাথে মোটেও খাপ খায় না। 'হায়াতু মুহাম্মদ' গ্রন্থের রচয়িতা একটি পর্যায় পর্যন্ত এসব গল্প ও উপাখ্যানের বানোয়াট হবার ব্যাপারে অবগত ছিলেন। তাই তিনি কখনও কখনও পূর্বোক্ত বিষয়াদি 'যেমন বলা হয়েছে ঠিক তেমনি'– এ বাক্যসহকারে উদ্ধৃত করেছেন।

এসব গল্প ও উপাখ্যানের বিপক্ষে আহলে বাইতপন্থী ধর্মীয় নেতৃবর্গ সর্বশক্তি নিয়োগ করে প্রতিরোধ করেছেন এবং সব কিছু বাতিল প্রমাণ করেছেন। উদাহরণস্বরূপ যুরারাহ্ ইমাম জাফর সাদিক (আ.)-কে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'যখন হযরত জিবরীল (আ.) মহানবী (সা.)-এর ওপর অবতীর্ণ হয়েছিলেন তখন তিনি কেন ভয় পাননি এবং ওহীকে শয়তানের ওয়াসওয়াসাহ্ (প্ররোচণা) বলে মনে করেননি?' তখন ইমাম সাদিক (আ.) বলেছিলেন, 'মহান আল্লাহ্ তাঁর নবীর ওপর প্রশান্তি অবতীর্ণ করেছিলেন এবং যা কিছু মহান আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে তাঁর কাছে পৌঁছত তা এমনই ছিল যেন তিনি তা প্রত্যক্ষ করছেন।'[৯]

প্রখ্যাত আলেম মরহুম আল্লামা তাবারসী তাঁর তাফসীর গ্রন্থে[১০] এ অংশে বলেছেন, 'উজ্জ্বল দলিল-প্রমাণ প্রেরণ করা ব্যতীত মহান আল্লাহ্ তাঁর নবীর ওপর কোন ওহী

অবতীর্ণ করতেন না। তিনি উজ্জ্বল দলিল-প্রমাণ এজন্য প্রেরণ করতেন যাতে মহানবী (সা.) নিশ্চিত হন যে, তাঁর কাছে যা কিছু ওহী হয় তা মহান আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকেই।'

কোন্ দিন প্রথম ওহী অবতীর্ণ হয়েছিল

মহানবী (সা.)-এর নবুওয়াত দিবস তাঁর জন্ম ও ওফাত দিবসের মতই ঐতিহাসিকদের দৃষ্টিতে নির্দিষ্ট নয়। শিয়া আলেমগণ প্রায় ঐকমত্য পোষণ করেন যে, মহানবী (সা.) ২৭ রজব নবুওয়াতের পদ লাভ করেন। ঐ দিন থেকেই তাঁর নবুওয়াত শুরু হয়েছিল। কিন্তু সুন্নী আলেমদের প্রসিদ্ধ অভিমত হচ্ছে, মহানবী (সা.) পবিত্র রমযান মাসে এ সুমহান মর্যাদা লাভ করেছিলেন এবং বরকতময় এ মাসেই তিনি নিখিল বিশ্বের স্রষ্টা মহান আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে জনগণকে পথ প্রদর্শন করার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত এবং রিসালাত ও নবুওয়াতের পদে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন।

যে বিষয়টি দ্বিতীয় অভিমতের দলিল হিসাবে বিবেচিত তা হচ্ছে পবিত্র কুরআনের ঐ সকল আয়াত যেগুলোতে উল্লিখিত হয়েছে যে, এ গ্রন্থ পবিত্র রমযান মাসে অবতীর্ণ হয়েছিল। যেহেতু নবুওয়াত দিবস ওহীর সূচনা এবং পবিত্র কুরআন অবতীর্ণ হওয়ার দিবস ছিল, সেহেতু অবশ্যই বলা উচিত যে, নবুওয়াত দিবসও পবিত্র কুরআন অবতীর্ণ হওয়ার মাসেই হতে হবে। আর ঐ মাসটি হচ্ছে পবিত্র রমযান মাস। এখন যেসব আয়াতে রমযান মাসে পবিত্র কুরআন অবতীর্ণ হওয়ার বিষয়টি স্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে সেগুলো নিম্নে উল্লেখ করা হল :

شَهْرُ رَمَضَانَ ٱلَّذِىٓ أُنزِلَ فِيهِ ٱلْقُرْءَانُ

'রমযান মাসেই পবিত্র কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে...।'[১১]

حمٓ ۝١ وَٱلْكِتَٰبِ ٱلْمُبِينِ ۝٢ إِنَّآ أَنزَلْنَٰهُ فِى لَيْلَةٍ مُّبَٰرَكَةٍ

'হা-মীম, স্পষ্ট বর্ণনাকারী গ্রন্থের (পবিত্র কুরআন) শপথ, নিশ্চয়ই আমরা এ গ্রন্থকে একটি বরকতময় রাত্রিতে অবতীর্ণ করেছি...।'[১২]

আর উক্ত বরকতময় রজনী হচ্ছে শবে কদর (মহিমাময় রাত্রি) যা সূরা কদরে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। এরশাদ হচ্ছে :

إِنَّآ أَنزَلْنَٰهُ فِى لَيْلَةِ ٱلْقَدْرِ ۝١

'আমরা তা (পবিত্র কুরআন) কদরের রাতে অবতীর্ণ করেছি।'[১৩]

মুহাদ্দিস ও মুফাস্‌সিরগণ বিভিন্ন উপায়ে উপরিউক্ত যুক্তি ও দলিল-প্রমাণ খণ্ডন করেছেন। আমরা তন্মধ্যে কেবল কয়েকটি এখানে উল্লেখ করব :

প্রথম উত্তর : উপরিউক্ত আয়াতসমূহ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, পবিত্র কুরআন রমযান মাসের একটি বরকতময় রজনীতে অবতীর্ণ হয়েছিল। আর উক্ত রজনী পবিত্র কুরআনে 'শবে কদর' অর্থাৎ ভাগ্য রজনী নামে পরিচিত হয়েছে। আর এসব আয়াত থেকে প্রতীয়মান হয় না যে, ঐ রাতেই পবিত্র কুরআন মহানবী (সা.)-এর পবিত্র হৃদয়ের ওপর অবতীর্ণ হয়েছিল; বরং পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন ধরনের নুযূল থাকার সম্ভাবনাই বেশি। এসব নুযূলের অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে মহানবীর ওপর পবিত্র কুরআনের ধারাবাহিক ও পর্যায়ক্রমিক নুযূল। আরেক ধরনের নুযূল হচ্ছে একত্রে একবারে সম্পূর্ণ কুরআনের নুযূল। লওহে মাহফূয (সংরক্ষিত ফলক) থেকে বাইতুল মামূরে সম্পূর্ণ কুরআন একত্রে একবারে অবতীর্ণ (নাযিল) হয়েছিল।[১৪] সুতরাং ২৭ রজব যদি মহানবী (সা.)-এর ওপর সূরা আলাকের কয়েকটি আয়াত এবং পবিত্র রমযান মাসে যদি লওহে মাহফূয নামক একটি স্থান থেকে অন্য এক স্থান যা রেওয়ায়েতসমূহে 'বাইতুল মামূর' নামে অভিহিত (হয়েছে) সেখানে সম্পূর্ণ কুরআন একত্রে একবারে অবতীর্ণ হয়, তাহলে কি এতে কোন অসুবিধা ও আপত্তি থাকতে পারে?

এ অভিমতের পক্ষে প্রমাণ হচ্ছে সূরা দুখানের ৩ নং আয়াত যাতে এরশাদ হচ্ছে : 'আমরা পবিত্র কিতাবটি (কুরআন) একটি বরকতময় রজনীতে অবতীর্ণ করেছি।' [যে সর্বনামটি 'কিতাব' (গ্রন্থ)-এর দিকে প্রত্যাগমন করে সেই সর্বনামটি প্রমাণস্বরূপ উপস্থাপন করলে] এ আয়াতের স্পষ্ট প্রকাশিত অর্থ হচ্ছে এই যে, সম্পূর্ণ কিতাবটি পবিত্র রমযানের একটি বরকতময় রজনীতে অবতীর্ণ হয়েছে। অবশ্যই এ নুযূলটি ঐ নুযূল থেকে ভিন্ন যা মহানবীর নবুওয়াতের মাকামে অভিষেকের দিবসে বাস্তবায়িত হয়েছিল। কারণ, নবুওয়াতের মাকামে অভিষেক দিবসে গুটিকতক আয়াতই (সূরা আলাকের প্রথম ৫ আয়াত) অবতীর্ণ হয়েছিল।

সার সংক্ষেপ

যেসব আয়াত থেকে প্রতীয়মান হয় যে, পবিত্র কুরআন রমযান মাসের কদরের পুণ্যময় রাতে অবতীর্ণ হয়েছিল সেগুলো থেকে প্রমাণিত হয় না যে, যে দিবসে মহানবী (সা.) নবুওয়াতের পদে অভিষিক্ত হয়েছিলেন এবং সর্বপ্রথম কয়েকটি আয়াতও অবতীর্ণ হয়েছিল সে দিবসটি ছিল পবিত্র রমযান মাসে। কারণ, উপরিউক্ত আয়াতসমূহ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, সম্পূর্ণ ঐশী গ্রন্থটি এ মাসে অবতীর্ণ হয়েছিল, অথচ মহানবীর নবুওয়াতের অভিষেক দিবসে কেবল গুটিকতক আয়াতই অবতীর্ণ হয়েছিল। এমতাবস্থায় এ মাসে (রমযান মাসে) লওহে মাহফূয থেকে বাইতুল মামূরে সমগ্র পবিত্র কুরআনের অবতীর্ণ হওয়াকেই সম্ভবত বুঝিয়ে থাকবে। শিয়া ও সুন্নী আলেমগণ এতদ্প্রসঙ্গে বেশ কিছু হাদীসও বর্ণনা করেছেন। বিশেষ করে আল আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মুহাম্মাদ আবদুল আযীম আয-যারকানী 'মানাহিলুল ইরফান ফী উলূমিল কুরআন' নামক গ্রন্থে ঐ সব রেওয়ায়েত বিস্তারিত বর্ণনা করেছেন।[১৫]

দ্বিতীয় উত্তর

আলেমদের পক্ষ থেকে সবচেয়ে শক্তিশালী ও দৃঢ় যে উত্তর এখন পর্যন্ত দেয়া হয়েছে তা হচ্ছে এই দ্বিতীয় উত্তর। আল্লামা তাবাতাবাঈ তাঁর মূল্যবান তাফসীর গ্রন্থ 'আল মীযান'-এ বিষয়টি ব্যাখ্যা করার জন্য অনেক পরিশ্রম করেছেন।[১৬] এ উত্তরটির সার সংক্ষেপ হল : 'আমরা এ গ্রন্থকে রমযান মাসে অবতীর্ণ করেছি'– পবিত্র কুরআনের এ আয়াতের প্রকৃত অর্থ কী? এ আয়াতের প্রকৃত অর্থ হচ্ছে সম্পূর্ণ কুরআনের প্রকৃত স্বরূপ (হাকীকত) রমযান মাসে মহানবী (সা.)-এর পবিত্র অন্তঃকরণের ওপর অবতীর্ণ হয়েছিল। কারণ, পর্যায়ক্রমিক (ধারাবাহিক) অস্তিত্ব ছাড়াও পবিত্র কুরআনের এমন এক প্রকৃত রূপ আছে যার সাথে মহান আল্লাহ্ তাঁর প্রিয় রাসূলকে রমযান মাসের কোন একটি নির্দিষ্ট রজনীতে পরিচিত করিয়েছিলেন।

যেহেতু মহানবী সম্পূর্ণ পবিত্র কুরআন সম্পর্কে অবগত ছিলেন, তাই যতক্ষণ পর্যন্ত পবিত্র কুরআনের ধারাবাহিক নুযূলের বিধান বাস্তবে জারী করা না হয়েছে ততক্ষণ পর্যন্ত তাঁর প্রতি মহান আল্লাহ্র পক্ষ থেকে পবিত্র কুরআনের ব্যাপারে ত্বরা না করার নির্দেশ দেয়া হয়েছিল।[১৭]

এ উত্তরটির সার সংক্ষেপ

পবিত্র কুরআনের যেমন একটি সার্বিক তাত্ত্বিক ও প্রকৃত অস্তিত্ব আছে যা একযোগে একত্রে (একবারেই) পবিত্র রমযান মাসে অবতীর্ণ হয়েছিল ঠিক তেমনি এ গ্রন্থের আরেকটি অস্তিত্ব আছে যা পর্যায়ক্রমিক (ধারাবাহিক)– যার সূচনা মহানবী (সা.)-এর নবুওয়াতে অভিষেক দিবসে কয়েকটি আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার মাধ্যমেই বাস্তবায়িত হয়েছে এবং মহানবীর জীবন সায়াহ্ন পর্যন্ত বলবৎ ছিল ।

তৃতীয় উত্তর

পবিত্র কুরআন অবতীর্ণ হওয়ার সাথে মহানবী (সা.)-এর নবুওয়াতের দায়িত্বে অভিষিক্ত হওয়ার বিষয়টি যুগপৎ ছিল না ।

ওহীর শ্রেণীবিভাগে সংক্ষেপে আলোচনা করা হয় যে, ওহীরও বেশ কিছু পর্যায় আছে । ওহীর প্রথম পর্যায় হল সত্য স্বপ্নদর্শন (এ পর্যায়ে নবী কেবল সত্য স্বপ্ন দর্শন করেন); ওহীর দ্বিতীয় পর্যায় হল নবী কর্তৃক গায়েবী ও ঐশী আহ্বান শুনতে পাওয়া, তবে এ ক্ষেত্রে তিনি কোন ফেরেশতাকে প্রত্যক্ষ করেন না; ওহীর চূড়ান্ত ও সর্বশেষ পর্যায় হচ্ছে নবী ফেরেশতার কাছ থেকে মহান আল্লাহ্‌র বাণী শোনেন যাঁকে তিনি দেখেন এবং যাঁর মাধ্যমে তিনি অন্যান্য জগতের প্রকৃত অবস্থা ও বাস্তবতাসমূহের সাথেও পরিচিত হন ।

যেহেতু মানবাত্মার একেবারে প্রাথমিক পর্যায় ওহীর বিভিন্ন পর্যায় ধারণ করতে অক্ষম সেহেতু অবশ্যই ওহী ধারণ করার বিষয়টি পর্যায়ক্রমিকভাবে বাস্তবায়িত হতে হবে । সুতরাং নির্দ্বিধায় বলা উচিত মহানবীর নবুওয়াতে অভিষেক দিবসে (২৭ রজব) এবং এর পরে আরও বেশ কিছুদিন পর্যন্ত তিনি স্বর্গীয় ঐশী আহ্বানই শুনতে পেতেন । তিনি শুনতে পেতেন যে, তিনি মহান আল্লাহ্‌র রাসূল । নবুওয়াত দিবসে তাঁর ওপর কোন আয়াতই অবতীর্ণ হয়নি । অতঃপর বেশ কিছুদিন পর পবিত্র রমযান মাসে পবিত্র কুরআনের ধারাবাহিক নুযূল শুরু হয় ।

সুতরাং সংক্ষেপে বলা যায় যে, রজব মাসে মহানবীর নবুওয়াতে অভিষিক্ত হওয়ার বিষয়টি ঐ মাসেই পবিত্র কুরআন অবতীর্ণ হওয়ার সাথে মোটেও সংশ্লিষ্ট নয় । এ

বক্তব্যের ভিত্তিতে যদি মহানবী রজব মাসে নবুওয়াতে অভিষিক্ত হন এবং পবিত্র কুরআন একই বছরের রমযান মাসে অবতীর্ণ হয় তাহলে কি কোন অসুবিধা আছে?

উপরিউক্ত উত্তরটি যদিও অনেক ঐতিহাসিক বর্ণনা ও বিবরণের সাথে খাপ খায় না (কারণ, ঐতিহাসিকগণ স্পষ্টভাবে বলেছেন যে, সূরা আলাকের কতিপয় আয়াত নবুওয়াতে অভিষিক্ত হওয়ার দিবসেই অবতীর্ণ হয়েছিল), কিন্তু এতদ্সত্ত্বেও এমন কিছু রেওয়ায়েত আছে যেগুলোতে মহানবীর নবুওয়াতে অভিষিক্ত হওয়ার দিবসের ঘটনাটি বলতে কেবল গায়েবী অর্থাৎ অদৃশ্য (ঐশী) আহ্বানের কথাই উল্লিখিত হয়েছে এবং পবিত্র কুরআন অথবা কতিপয় আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার বিষয়টি বর্ণিত হয়নি; বরং নবুওয়াত দিবসের ঘটনা ঠিক এভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, ঐ দিন মহানবী একজন ফেরেশতাকে দেখতে পেয়েছিলেন যিনি তাঁকে সম্বোধন করে বলেছিলেন, يا محمد أنك لرسول الله 'হে মুহাম্মাদ! নিশ্চয়ই আপনি মহান আল্লাহ্র রাসূল।' আবার কিছু সংখ্যক বর্ণনায় কেবল গায়েবী আহ্বান ও সম্বোধনধ্বনি শোনার কথাই বর্ণিত হয়েছে এবং কোন ফেরেশতাকে দেখার বিষয় উল্লিখিত হয়নি।

চতুর্থ উত্তর

চতুর্থ উত্তরে বলা হয়েছে যে, মহানবীর বেসাত (নবুওয়াতে অভিষিক্ত হওয়া) রজব মাসেই হয়েছিল এবং গোপনে দাওয়াত বা ইসলাম প্রচারের পর্যায় যা বেসাতের পর থেকে দীর্ঘ তিন বছর স্থায়ী হয়েছিল তা অতিবাহিত হওয়ার পরই পবিত্র কুরআনের অবতরণ (নুযূল) শুরু হয়।

ওহী অবতীর্ণ বন্ধ থাকা প্রসঙ্গ

ওহীর আলোয় মহানবী (সা.)-এর আত্মা ও মন আলোকিত হয়ে গিয়েছিল; তিনি অত্যন্ত ভারী ও গুরুদায়িত্ব সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তা করতেন যা মহান আল্লাহ্ তাঁর ওপর অর্পণ করেছিলেন। বিশেষ করে ঐ সময় যখন মহান আল্লাহ্ তাঁকে সম্বোধন করে বলেছিলেন, يا أيها المدثر قُم فأنذر وربك فكبر 'হে চাদরাবৃত! উঠুন, সতর্ক করুন, আপন পালনকর্তার মাহাত্ম্য ঘোষণা করুন।'

এ স্থলে এসে ঐতিহাসিকগণ, বিশেষ করে ঐতিহাসিক তাবারী যাঁর ইতিহাসগ্রন্থ ইয়াহুদী ও খ্রিস্টানদের কল্পকাহিনী ও উপাখ্যান দিয়ে সজ্জিত নয় তিনি انقطاع وحي অর্থাৎ 'ওহী অবতীর্ণ বন্ধ থাকা' শীর্ষক একটি বিষয়ের অবতারণা করে বলেছেন, 'ওহীর ফেরেশতাকে দেখা এবং পবিত্র কুরআনের কয়েকটি আয়াত শ্রবণ করার পর মহানবী (সা.) মহান আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে আরও বাণী অবতীর্ণ হওয়ার জন্য অপেক্ষা করতে থাকেন, কিন্তু না ঐ সুদর্শন ফেরেশতার কোন হদিস ছিল, না আর কোন গায়েবী বার্তা তিনি শুনতে পেলেন।

রিসালাতের সূচনালগ্নে যদি প্রত্যাদেশ বন্ধ থাকার বিষয় সত্য হয়ে থাকে তাহলে তা পবিত্র কুরআনের ধারাবাহিক অবতরণ ব্যতীত অন্য কিছু ছিল না। মহান আল্লাহ্‌র ঐশী ইচ্ছা এটাই ছিল যে, বিশেষ কল্যাণের ভিত্তিতে তিনি তাঁর ওহী ধারাবাহিক ও পর্যায়ক্রমিকভাবে অবতীর্ণ করবেন। আর যেহেতু ওহীর সূচনালগ্নে মহান আল্লাহ্‌র ওহী পরপর অর্থাৎ অবিরামভাবে অবতীর্ণ হয়নি, তাই এ বিষয়টি ওহী অবতরণ বিচ্ছিন্ন হওয়ার অর্থে আলোচিত হয়েছে; আর কখনই প্রকৃত অর্থে ওহী অবতীর্ণ হওয়া বিচ্ছিন্ন ও বন্ধ থাকেনি।

যেহেতু এ বিষয়টি স্বার্থান্বেষী মতলববাজ লেখকদের (অসদুদ্দেশ্য চরিতার্থ করার) দলিল-প্রমাণে পরিণত হয়েছে, তাই আমরা এ ব্যাপারে এমনভাবে আলোচনা করতে চাই যার ফলে স্পষ্ট হয়ে যাবে যে, ওহী অবতরণ বন্ধ ও বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার শিরোনামে যে বিষয়টি উল্লিখিত হয়েছে তা বাস্তবতাবর্জিত এবং এ ভ্রান্ত বিষয়ের সমর্থনে পবিত্র কুরআনের যে কয়টি আয়াত ব্যবহার করা হয়েছে আসলে এসব আয়াতের এ ধরনের প্রয়োগেরও কোন বাস্তবতা নেই।

বিষয়টি স্পষ্ট করার জন্য যে ঘটনা তাবারী বর্ণনা করেছেন তা আমরা এখানে উল্লেখ করব এবং এরপর আমরা তা খণ্ডন করব। তিনি লিখেছেন : যখন ওহীর পরম্পরা বিচ্ছিন্ন ও বন্ধ হয়ে গেল তখন নবুওয়াতে অভিষেকের সূচনালগ্নে মহানবী (সা.)-এর মধ্যে যে অস্থিরতা, সন্দেহ ও সংশয় দেখা দিয়েছিল তার পুনরাবৃত্তি হল। হযরত খাদীজাও তাঁর মত অস্থির হয়ে তাঁকে বলেছিলেন : 'আমি অনুমান করছি, আল্লাহ্‌ আপনার সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করেছেন।' তিনি এ কথা শোনার পর হিরা পর্বতের দিকে চলে গেলেন। ঠিক তখনই পুনরায় তাঁর কাছে ওহী অবতীর্ণ হল এবং তাঁকে নিম্নোক্ত এ কয়টি আয়াতের মাধ্যমে সম্বোধন করে বলা হল :

وَٱلضُّحَىٰ ﴿١﴾ وَٱلَّيۡلِ إِذَا سَجَىٰ ﴿٢﴾ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ ﴿٣﴾ وَلَلۡأٓخِرَةُ خَيۡرٞ
لَّكَ مِنَ ٱلۡأُولَىٰ ﴿٤﴾ وَلَسَوۡفَ يُعۡطِيكَ رَبُّكَ فَتَرۡضَىٰٓ ﴿٥﴾ أَلَمۡ يَجِدۡكَ يَتِيمٗا
فَـَٔاوَىٰ ﴿٦﴾ وَوَجَدَكَ ضَآلّٗا فَهَدَىٰ ﴿٧﴾ وَوَجَدَكَ عَآئِلٗا فَأَغۡنَىٰ ﴿٨﴾ فَأَمَّا
ٱلۡيَتِيمَ فَلَا تَقۡهَرۡ ﴿٩﴾ وَأَمَّا ٱلسَّآئِلَ فَلَا تَنۡهَرۡ ﴿١٠﴾ وَأَمَّا بِنِعۡمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثۡ ﴿١١﴾

'মধ্যাহ্নের শপথ, আর রাতের শপথ যার আঁধার (সব কিছুকে) ছেয়ে ফেলে; আপনার প্রভু আপনাকে ত্যাগ করেননি এবং (আপনার প্রতি) শত্রুতায় লিপ্ত হননি। নিশ্চয়ই দুনিয়া থেকে আখেরাত আপনার জন্য উত্তম। অতি শীঘ্রই আপনার প্রভু আপনাকে এমন সব জিনিস দেবেন যে, এর ফলে আপনি সন্তুষ্ট ও খুশী হবেন। আপনি স্মরণ করুন, যখন আপনি অনাথ ছিলেন তখন তিনি আপনাকে আশ্রয় দিয়েছিলেন। যখন আপনি অস্থির ও দিশেহারা ছিলেন তখন আপনাকে তিনি পথ-প্রদর্শন করেছেন, যখন আপনি দরিদ্র ও রিক্তহস্ত ছিলেন তখন তিনি আপনাকে অভাবশূন্য, বিত্তশালী করেছেন। তাই কখনই কোন অনাথকে কষ্ট দিবেন না এবং ভিক্ষুকের প্রতি রাগ করবেন না। আর আপনার প্রভুর নিয়ামতের ব্যাপারে আলোচনা করুন।'[১৮]

এসব আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার কারণে মহানবী (সা.)-এর অন্তরে আনন্দ ও প্রশান্তির উদ্ভব হয় এবং তখন তিনি বুঝতে পারলেন যে, যা কিছু তাঁর ব্যাপারে বলা হয়েছে তা সবই ভিত্তিহীন ও মিথ্যা।

এটি ইতিহাস হতে পারে না, বরং মিথ্যা কল্পকাহিনী

হযরত খাদীজা (আ.)-এর জীবনেতিহাস ইতিহাসের পাতায় পাতায় সুগ্রথিত হয়ে আছে। খাদীজার দৃষ্টিপটে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সা.)-এর উত্তম চারিত্রিক গুণাবলি এবং সৎ কর্মসমূহ ছিল জীবন্ত। তিনি মহান আল্লাহ্‌কে ন্যায়পরায়ণ বলে বিশ্বাস করতেন। তাই তাঁর মধ্যে কীভাবে মহান আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের ব্যাপারে এ ধরনের অদ্ভুত ও ভুল ধারণার সৃষ্টি হতে পারে?

এমন ব্যক্তিকেই নবুওয়াতে অভিষিক্ত করা হয় যিনি প্রশংসিত ও মহান চারিত্রিক গুণাবলির অধিকারী। আর স্বয়ং মহানবী (সা.) যতক্ষণ পর্যন্ত এ ধরনের উন্নত চারিত্রিক গুণাবলি এবং বিশেষ যোগ্যতার অধিকারী না হবেন ততক্ষণ পর্যন্ত তাঁকে এ পদও দেয়া হবে না। এসব চারিত্রিক গুণের শীর্ষে রয়েছে ইসমাত (পবিত্রতা), আত্মিক প্রশান্তি ও স্থিরতা এবং মহান স্রষ্টার ওপর নির্ভরশীলতা; আর এ ধরনের গুণের অধিকারী হওয়ার কারণে তাঁর মনে এ ধরনের অলীক ধ্যান-ধারণার উদ্ভব হওয়া সম্পূর্ণ অসম্ভব ও অবাস্তব। মনীষিগণ বলেছেন, মহান নবীদের পূর্ণতা প্রাপ্তির প্রক্রিয়া তাঁদের শৈশব ও বাল্যকাল থেকেই শুরু হয় এবং তাঁদের দৃষ্টির সামনে থেকে পর্দা ও অন্তরায়সমূহ একের পর এক বিদূরিত হতে থাকে এবং তাঁদের জ্ঞানগত যোগ্যতা পূর্ণতার পর্যায়ে উপনীত হয়। এর ফলে তাঁরা যা শোনেন এবং দেখেন সে সম্পর্কে সামান্যতম সন্দেহ তাঁদের মধ্যে দেখা দেয় না। যে ব্যক্তি এসব পর্যায় আয়ত্ত করতে সক্ষম হবেন, মানুষের বিভিন্ন কথাবার্তা ও মন্তব্য তাঁর অন্তরে বিন্দুমাত্র সন্দেহ ও সংশয়ের সৃষ্টি করতে পারবে না।

সূরা আদ-দুহার আয়াতসমূহ, বিশেষ করে ما ودعك ربك وما قلى অর্থাৎ 'আপনার প্রভু আপনাকে ত্যাগ করেননি এবং (আপনার বিরুদ্ধে) শত্রুতায় লিপ্ত হননি'– এ আয়াত থেকে এতটুকু প্রতীয়মান হয় যে, কোন এক ব্যক্তি মহানবী (সা.)-কে এ কথা বলেছিল। তবে কে বলেছিল এবং তার এ কথা কতখানি মহানবী (সা.)-এর মন-মানসিকতার ওপর (নেতিবাচক) প্রভাব বিস্তার করেছিল এ ব্যাপারে কোন কিছুই উক্ত আয়াতে বর্ণিত হয়নি।

কোন কোন মুফাস্‌সির বলেছেন, কয়েকজন মুশরিক মহানবীকে এ কথা বলেছিল। আর এ সম্ভাবনার ভিত্তিতেই সূরা আদ-দুহার সকল আয়াত অবতীর্ণ হওয়া ওহীর সূচনালগ্নের সাথে সংশ্লিষ্ট হতে পারে না। কারণ, নবুওয়াতের অভিষেকের সূচনালগ্নে একমাত্র খাদীজা ও আলী ব্যতীত আর কোন ব্যক্তিই ওহী সম্পর্কে ওয়াকিবহাল ছিল না– যার ফলে তার পক্ষে এ ব্যাপারে বিরূপ মন্তব্য ও কটূক্তি করা সম্ভব হবে। এমনকি পুরো তিন বছর মহানবী (সা.)-এর রিসালাত ও নবুওয়াত অধিকাংশ মুশরিকের নিকট থেকে গোপন রাখা হয়েছিল। এ সময় তিনি সাধারণ মানুষের কাছে ইসলাম ধর্ম প্রচারের আদেশ পাননি। অতঃপর فاصدع بما تؤمر 'আপনি যে ব্যাপারে আদিষ্ট হচ্ছেন তা প্রকাশ্যে প্রচার করুন'– এ আয়াত অবতীর্ণ হলে তিনি

প্রকাশ্যে ইসলাম ধর্ম গ্রহণের জন্য জনগণকে আহ্বান জানিয়েছিলেন অর্থাৎ প্রকাশ্যে মহানবীর দাওয়াতী কর্মকাণ্ড শুরু হয় উপরিউক্ত আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পরপরই।

ওহী অবতরণ বন্ধ ও বিচ্ছিন্ন হওয়ার ব্যাপারে সীরাত রচয়িতাদের মধ্যে মতপার্থক্য

পবিত্র কুরআনে কোথাও ওহী অবতরণ বন্ধ ও বিচ্ছিন্ন থাকার কথা বর্ণিত হয়নি। এমনকি এতৎসংক্রান্ত সামান্যতম ইঙ্গিতও দেয়া হয়নি। এ বিষয়টি কেবল সীরাত ও তাফসীরের গ্রন্থসমূহেই দেখা যায়। আর ওহী অবতরণ বন্ধ ও বিচ্ছিন্ন হওয়ার কারণ ও সময়কালের ব্যাপারে সীরাত রচয়িতা ও মুফাস্‌সিরদের এতটা মতপার্থক্য রয়েছে যে, এর ফলে তাঁদের কারও বক্তব্য ও অভিমতের ওপর মোটেও নির্ভর করা যায় না। আমরা নিচে তাঁদের অভিমত ও বক্তব্যসমূহ উত্থাপন করছি :

১. ইয়াহুদীরা মহানবী (সা.)-কে আত্মা, গুহাবাসীর (আসহাবে কাহাফের) কাহিনী ও যুলকারনাইন সম্পর্কে প্রশ্ন করেছিল। মহানবী (সা.) 'ইনশাআল্লাহ্' অর্থাৎ 'আল্লাহ্‌পাক যদি চান' না বলে বলেছিলেন, 'আগামীকাল আমি তোমাদের প্রশ্নগুলোর উত্তর দেব।' এ কারণে মহান আল্লাহ্‌র ওহী অবতীর্ণ হওয়া বন্ধ হয়ে গেল। মুশরিকরা ওহী অবতীর্ণ হতে বিলম্ব হওয়ায় খুব আনন্দিত হয়ে বলতে লাগল, 'মহান আল্লাহ্ মুহাম্মাদকে ত্যাগ করেছেন।' মুশরিকদের এ অমূলক চিন্তা খণ্ডন করার জন্যই সূরা দুহা অবতীর্ণ হয়।'[১৯]

সুতরাং উপরিউক্ত বর্ণনার ভিত্তিতে সূরা আদ-দুহা মহানবী (সা.)-এর নবুওয়াত ও রিসালাতে অভিষেকের সূচনালগ্নের সাথে সংশ্লিষ্ট তা বলা যায় না। কারণ, ইয়াহুদী আলেমগণ মহানবী (সা.)-এর কাছে উপরিউক্ত বিষয় তিনটি সম্পর্কে নবুওয়াতে অভিষেকের আনুমানিক সপ্তম বর্ষে প্রশ্ন করেছিল যখন মহানবী (সা.)-এর রিসালাতের বাস্তবতা ইয়াহুদী আলেমদের কাছে উত্থাপন করে তা সত্য কিনা তা জানার জন্য কুরাইশদের পক্ষ থেকে একটি প্রতিনিধিদল মদীনা সফরে গিয়েছিল। ঐ সময় ইয়াহুদী পণ্ডিতগণ উক্ত প্রতিনিধি দলকে উপরিউক্ত তিনটি বিষয়ে মহানবী (সা.)-কে প্রশ্ন করার পরামর্শ দিয়েছিল।[২০]

২. মহানবী (সা.)-এর খাটের নিচে একটি কুকুরের বাচ্চা মারা গেলে কেউ তা দেখেনি। মহানবী (সা.) ঘর থেকে বাইরে গেলে খাওলা ঘর ঝাড় দেয়ার সময় তা বাইরে ফেলে দেন। ঐ সময় ওহীর ফেরেশতা সূরা আদ-দুহাসহ আগমন করেন। মহানবী (সা.)-কে ফেরেশতা বলেছিলেন, 'যে গৃহে কুকুর আছে সেই গৃহে আমরা (ফেরেশতাগণ) প্রবেশ করি না।'[২১]

৩. মুসলমানরা ওহী অবতীর্ণ হওয়ার ক্ষেত্রে বিলম্ব হওয়ার কারণ সম্পর্কে প্রশ্ন করলে মহানবী (সা.) বলেছিলেন, 'যখন তোমরা তোমাদের নখ ও গোঁফ ছোট কর না তখন কীভাবে ওহী অবতীর্ণ হবে?'[২২]

৪. হযরত উসমান একবার কিছু আঙ্গুর অথবা রসালো খেজুর হাদিয়াস্বরূপ মহানবী (সা.)-এর কাছে পাঠিয়েছিলেন। ভিক্ষুক এলে মহানবী তা তাকে দিয়ে দেন। হযরত উসমান ঐ আঙ্গুর বা খেজুর ঐ ভিক্ষুকের কাছ থেকে কিনে তা পুনরায় মহানবীর কাছে প্রেরণ করেন। আবারও ঐ ভিক্ষুক মহানবী (সা.)-এর কাছে যায় এবং এ কাজ তিনবার সংঘটিত হয়। অবশেষে মহানবী (সা.) দয়ার্দ্র কণ্ঠে তাকে জিজ্ঞাসা করেন, 'তুমি ভিক্ষুক, না ব্যবসায়ী।' ঐ ভিক্ষুক মহানবী (সা.)-এর কথায় খুব মর্মাহত হয় এবং এ কারণেই মহানবীর ওপর ওহী অবতীর্ণ হওয়ার ক্ষেত্রে বিলম্ব ঘটে।[২৩]

৫. মহানবী (সা.)-এর কোন এক স্ত্রীর অথবা আত্মীয়ের কুকুরশাবক মহানবী (সা.)-এর কাছে জিবরীল (আ.)-এর অবতীর্ণ হওয়ার ক্ষেত্রে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল।[২৪]

৬. মহানবী (সা.) ওহী অবতরণে বিলম্ব হওয়ার কারণ জিজ্ঞাসা করলে জিবরীল (আ.) বলেছিলেন, 'এ ব্যাপারে আমার কোন ইখতিয়ার নেই।'

এরপরও এ ক্ষেত্রে আরও কিছু অভিমত আছে। আগ্রহী পাঠকবর্গ বিভিন্ন তাফসীর গ্রন্থ অধ্যয়ন করতে পারেন।[২৫]

কিন্তু তাবারী এমন একটি কারণ উদ্ধৃত করেছেন এতৎসংক্রান্ত বিভিন্ন কারণের মধ্যে কেবল এ দিকটির প্রতিই অর্বাচীন লেখকগণ আকৃষ্ট হয়েছেন; আর তাঁরা একে মহানবী (সা.)-এর অন্তরে সন্দেহ ও সংশয়ের উদ্রেক হওয়ার নিদর্শন বলে গণ্য করেছেন। সেই কারণ হচ্ছে, হিরা পর্বতের গুহায় ওহী অবতরণ ও নবুওয়াতে অভিষেকের ঘটনার পর মহানবী (সা.)-এর ওপর ওহী অবতরণ হওয়া বন্ধ হয়ে যায়। হযরত খাদীজা (আ.) তখন মহানবীকে বলেছিলেন, 'আমি ধারণা করছি, মহান

আল্লাহ্ আপনার ওপর অসন্তুষ্ট ও ক্রুদ্ধ হয়েছেন এবং আপনার প্রতি শত্রুভাবাপন্ন হয়েছেন।' আর ঠিক তখনই ওহী অবতীর্ণ হয় :

مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ

'আপনার প্রভু আপনাকে ত্যাগ করেননি এবং আপনার প্রতি শত্রুভাবাপন্নও হননি।'[২৬]

এসব অর্বাচীন লেখকের দুরভিসন্ধি পোষণ অথবা যাচাই-বাছাই না করার প্রমাণ হচ্ছে এই যে, এ ব্যাপারে এত সব বর্ণনা থাকতে তাঁরা কেবল এ বর্ণনাটি গ্রহণ করে তা এমন এক ব্যক্তিত্বের ব্যাপারে তাঁদের মতামতের ভিত্তি হিসাবে দাঁড় করিয়েছেন যাঁর সমগ্র জীবনে সন্দেহ ও সংশয়ের কোন নিদর্শনই খুঁজে পাওয়া যাবে না। নিম্নোক্ত দিকগুলো বিবেচনা করলে উপরিউক্ত বর্ণনার ভিত্তিহীনতা ও মিথ্যা হওয়ার বিষয়টি সুস্পষ্ট হয়ে যাবে। দিকগুলো হল :

১. হযরত খাদীজা (আ.) এমন এক মহীয়সী নারী ছিলেন যিনি সর্বদা মহানবীকে ভালবাসতেন এবং জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তিনি স্বামীর পথে আত্মত্যাগ করে গেছেন। তিনি তাঁর সমুদয় ধন-সম্পদ মহানবী (সা.)-এর সুমহান লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করার জন্য ওয়াক্ফ্ করে দিয়েছিলেন। মহানবী (সা.)-এর নবুওয়াতে অভিষেকের বর্ষে তাঁদের বৈবাহিক জীবনের ১৫টি বছর অতিবাহিত হয়েছিল। এ দীর্ঘ সময় হযরত খাদীজা মহানবী (সা.) থেকে কেবল পবিত্রতা ব্যতীত আর কিছুই প্রত্যক্ষ করেননি। তাই মহানবীর প্রতি অনুরক্ত এমন নারীর পক্ষে এ ধরনের কর্কশ ও নিষ্ঠুর কথা বলা কখনই সম্ভব নয়।

২. ما ودعك ربك وما قلى (আপনার প্রভু আপনাকে ত্যাগ করেননি এবং আপনার বিরুদ্ধে শত্রুতায় লিপ্ত হননি)– এ আয়াত থেকে প্রতীয়মান হয় না যে, হযরত খাদীজা এ ধরনের উক্তি করে থাকতে পারেন; বরং এ আয়াত থেকে এতটুকু প্রমাণিত হয় যে, মহানবী (সা.)-এর ব্যাপারে কোন ব্যক্তি এ ধরনের মন্তব্য করেছিল। তবে এ উক্তি কে করেছিল এবং কেনই বা সে এ ধরনের উক্তি করেছিল তা স্পষ্ট নয়।

৩. এ ঘটনা বা কাহিনীর বর্ণনাকারী একদিন হযরত খাদীজাকে মহানবী (সা.)-এর ভরসা ও সান্ত্বনা দানকারী হিসাবে এভাবে পরিচিত করিয়ে দেন যে, তিনি এমনকি মহানবী (সা.)-কে আত্মহত্যা করা থেকে বিরত রেখেছিলেন, অথচ আরেকদিন সে

একই ব্যক্তি হযরত খাদীজার চেহারা এমনভাবে তুলে ধরেছেন যে, তিনি (নাউযুবিল্লাহ্) নাকি মহানবীকে বলেছিলেন, 'মহান আল্লাহ্ আপনার শত্রুতায় লিপ্ত হয়েছেন।' তাহলে আমরা কি এ কথা বলতে পারি না যে, মিথ্যাবাদীর স্মৃতিশক্তি নেই?

৪. হিরা পর্বতের গুহার ঘটনা অর্থাৎ নবুওয়াতের অভিষেক এবং সূরা আলাকের কয়েকটি আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর সূরা দুহা অবতীর্ণ হওয়া পর্যন্ত যদি ওহী অবতরণ বন্ধ থাকে, তাহলে সূরা দুহাকেই অবতরণের ধারাবাহিকতার দৃষ্টিকোণ থেকে পবিত্র কুরআনের দ্বিতীয় সূরা বলে গণ্য করতে হবে, অথচ অবতীর্ণ হওয়ার ধারাবাহিকতা অনুসারে এ সূরা পবিত্র কুরআনের দশম সূরা।[২৭]

সূরা দুহা অবতীর্ণ হওয়া পর্যন্ত যেসব সূরা অবতীর্ণ হয়েছিল সেগুলো হল : ১. সূরা আল আলাক, ২. সূরা আল কলম, ৩. সূরা আল মুয্যাম্মিল, ৪. সূরা আল মুদ্দাস্সির, ৫. সূরা লাহাব, ৬. সূরা আত তাকভীর, ৭. সূরা আল ইনশিরাহ্, ৮. সূরা আল আসর, ৯. সূরা আল ফাজ্র এবং ১০. সূরা আদ দুহা।

ইয়াকূবী তাঁর ইতিহাস গ্রন্থে সূরা দুহা অবতীর্ণ হওয়ার তারিখের দৃষ্টিতে পবিত্র কুরআনের তৃতীয় সূরা হিসাবে গণ্য করেছেন। আর এ অভিমতটিও উপরিউক্ত বর্ণনার সাথে সামঞ্জস্যশীল নয়।

ওহী অবতরণ কতদিন বন্ধ ছিল এতৎসংক্রান্ত মতপার্থক্য

ওহী অবতরণ বন্ধ থাকার সময়কাল অত্যন্ত অস্পষ্ট এবং বিভিন্নভাবে তা বর্ণিত হয়েছে। আর তাফসীরের গ্রন্থসমূহে ওহী অবতরণ কতদিন বন্ধ ছিল সে ব্যাপারে নিম্নোক্ত বক্তব্যসমূহ পরিলক্ষিত হয়। যেমন ৪ দিন, ১২ দিন, ১৫ দিন, ১৯ দিন, ২৫ দিন ও ৪০ দিন।

তবে পবিত্র কুরআনের ধারাবাহিক অবতরণের অন্তর্নিহিত দর্শন নিয়ে যদি আমরা পর্যালোচনা করি তাহলে দেখতে পাব যে, ওহী অবতরণ বন্ধ থাকার বিষয়টি কোন বিচ্ছিন্ন ও ব্যতিক্রমধর্মী ঘটনা ছিল না। কারণ, পবিত্র কুরআন প্রথম দিন থেকেই

ঘোষণা করেছে যে, মহান আল্লাহ্ এ গ্রন্থটি (কুরআন) ধীরে ধীরে (পর্যায়ক্রমে) নাযিল করার ইচ্ছা করেছেন। এ প্রসঙ্গে এরশাদ হয়েছে :

وَقُرْءَانًا فَرَقْنَٰهُ لِتَقْرَأَهُۥ عَلَى ٱلنَّاسِ عَلَىٰ مُكْثٍ

'আর এ কুরআনকে ধাপে ধাপে নাযিল করেছি যাতে আপনি তা ধীরে ধীরে বিরতিসহকারে জনগণের কাছে পাঠ করেন...।'[২৮]

পবিত্র কুরআনের অন্যত্র এ গ্রন্থের পর্যায়ক্রমিক অবতরণের মূল রহস্য উন্মোচন করে বলা হয়েছে :

وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ ٱلْقُرْءَانُ جُمْلَةً وَٰحِدَةً ۚ كَذَٰلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِۦ فُؤَادَكَ ۖ وَرَتَّلْنَٰهُ تَرْتِيلًا ﴿٣٢﴾

'আর কাফিররা বলেছে : কেন কুরআনকে একবারে অবতীর্ণ করা হয়নি; আর আমরা তা এভাবেই অবতীর্ণ করেছি যাতে আমরা আপনার অন্তঃকরণকে দৃঢ় ও স্থির রাখতে পারি এবং আমরা এ গ্রন্থকে এক ধরনের বিশেষ শৃঙ্খলা দান করেছি।'[২৯]

আমরা যদি পবিত্র কুরআনের অবতীর্ণ হওয়ার ব্যাপারে একটু গভীরভাবে চিন্তা করি, তাহলে কখনই এ আশা করা উচিত নয় যে, প্রতিদিন প্রতিটি মুহূর্তে হযরত জিবরীল (আ.) মহানবী (সা.)-এর সাথে যোগাযোগ রাখবেন এবং আয়াত অবতীর্ণ হবে; বরং পবিত্র কুরআনের পর্যায়ক্রমিক অবতরণের যেসব অন্তর্নিহিত রহস্য ও কারণ বিদ্যমান এবং মুসলিম গবেষক আলেমগণ যেগুলো বিশদ ব্যাখ্যা করেছেন[৩০] সেগুলোর জন্যই পবিত্র কুরআন চাহিদা ও প্রয়োজন মাফিক বিভিন্ন সময়গত ব্যবধানে প্রশ্নকারীদের প্রশ্নসমূহের ভিত্তিতে অবতীর্ণ হয়েছে। প্রকৃতপ্রস্তাবে কখনই ওহী অবতরণ বন্ধ থাকেনি; বরং ওহী তাৎক্ষণিক অবতরণের কোন কারণই আসলে তখন ছিল না।

অনুবাদ : মোহাম্মাদ মুনীর হোসেইন খান

তথ্যসূত্র ও টীকা

১. সূরা আলাক : ১-৫

২. সীরাতে ইবনে হিশাম, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৩৬; সহীহ আল বুখারী, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩; হাদীসের এ অংশটি যা আমরা এখানে বর্ণনা করেছি তা সহীহ (সত্য) ও নির্ভুল। তবে এ হাদীসের নিচে পাদটীকায় কোন শোভাবর্ধক বাড়তি বর্ণনা নেই; আর যদি থেকে থাকে তাহলে তা অবশ্যই প্রত্যাখ্যাত বলে গণ্য হবে। আমরা মাফাহীমুল কুরআন গ্রন্থের ৩য় খণ্ডে সনদ ও মতনের (মূল পাঠ) দিক থেকে এ হাদীস প্রসঙ্গে আলোচনা করেছি।

৩. মাজমাউল বায়ান, ১০ম খণ্ড, পৃ. ৩৮৪

৪. তাবাকাতে ইবনে সা'দ, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৭৯; হায়াতু মুহাম্মদ (সা.), ১ম খণ্ড, পৃ. ১৯৫

৫. তারিখে তাবারী, ২য় খণ্ড, পৃ. ২০৫

৬. তাফসীরে তাবারী, ৩০তম খণ্ড, পৃ. ১৬১, সূরা আলাকের ব্যাখ্যা এবং সীরাতে ইবনে হিশাম, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৩৮

৭. সূরা ত্বাহা : ২৯

৮. هذا الناموس الّذي أنزل على موسى بن عمران- সীরাতে ইবনে হিশাম, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৩৮; মরহুম আল্লামা মাজলিসী বিহারুল আনওয়ার গ্রন্থের ১৮তম খণ্ডের ২২৮ পৃষ্ঠায় আল মুনতাকা গ্রন্থ থেকে এবং و عيسى 'এবং ঈসা' শব্দও বর্ণনা করেছেন; তবে এ কাহিনীর উৎস সহীহ বুখারী ও সীরাতে ইবনে হিশামে و عيسى শব্দটির উল্লেখ নেই।

৯. إنّ الله اتخذ عبدا رسولا أنزل عليه السكينة و الوقار فكان الّذي يأتيه من قبل الله مثل الّذي يراه بعينه- বিহারুল আনওয়ার, ১১তম খণ্ড, পৃ. ৫৬

১০. মাজমাউল বায়ান, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৮৪

১১. সূরা বাকারাহ্ : ১৮৫

১২. সূরা দুখান : ১-৩

১৩. সূরা কদর : ১

১৪. লওহে মাহফূয ও বাইতুল মামূর সংক্রান্ত ব্যাখ্যা জানার জন্য আগ্রহী পাঠকবর্গকে তাফসীরের গ্রন্থসমূহ অধ্যয়ন করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

১৫. মানাহিলুল ইরফান ফী উলূমুল কুরআন, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৭

১৬. আল মীযান, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৪-১৬

১৭. لا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه 'আপনার প্রতি ওহী (অবতীর্ণ) করার আগেই পবিত্র কুরআনের ব্যাপারে ত্বরা করবেন না'– সূরা ত্বাহা : ১১৪

১৮. সূরা দুহা : ১-১১

১৯. তাফসীর-ই রুহুল মাআনী, ৩০তম খণ্ড, পৃ. ১৫৭; সীরাতে হালাবী, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৪৯-৩৫০
২০. সীরাতে ইবনে হিশাম, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩০০-৩০১
২১. তাফসীরে কুরতুবী, ১০ম খণ্ড, পৃ. ৭১-৮৩; সীরাতে হালাবী, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৪৯
২২. প্রাগুক্ত
২৩. তাফসীরে রূহুল মাআনী, ৩০তম খণ্ড, পৃ. ১৫৭
২৪. তাফসীরে তাবারীর টীকা সম্বলিত 'গোরায়েবুল কুরআন' (পবিত্র কুরআন সংক্রান্ত আশ্চর্যজনক বিষয়াদি) নামক গ্রন্থ; তাফসীরে আবুল ফাতূহ, ১২তম খণ্ড, পৃ. ১০৮
২৫. মাজমাউল বায়ান, ১০ম খণ্ড, সূরা আদ দুহার তাফসীর
২৬. তাফসীরে তাবারী, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২৫২
২৭. যানজানী প্রণীত তারীখুল কুরআন, পৃ. ৫৮
২৮. সূরা আল ইসরা : ১০৬
২৯. সূরা ফুরকান : ৩২
৩০. পবিত্র কুরআনের পর্যায়ক্রমিক অবতরণের রহস্যসমূহ সম্পর্কে ভালভাবে অবগত হওয়ার জন্য 'খিমা-ই ইনসানে কামেল দার কুরআন' (পবিত্র কুরআনে ইনসানে কামিলের স্বরূপ) নামক গ্রন্থের ১৪০-১৫০ পৃষ্ঠা অধ্যয়ন করুন।

[ইরান দূতাবাসের কালচারাল সেন্টার কর্তৃক প্রকাশিত, আয়াতুল্লাহ জাফর সুবহানী প্রণীত চিরভাস্বর মহানবী (সা.) গ্রন্থের প্রথম খণ্ড হতে সংকলিত।]

প্রজ্ঞাময় আলী ইবনে আবি তালিব (আ.)

আব্দুল কুদ্দুস বাদশা

জ্ঞানের প্রকৃষ্ট রূপই প্রজ্ঞা। আরবি কিম্বা ফারসি ভাষায় হিকমাত। পবিত্র কুরআনে জ্ঞান ও জ্ঞানীদের যেমন প্রশংসা-স্তুতি করা হয়েছে, হিকমাত ও হাকীমদের প্রশংসা করা হয়েছে তার চেয়েও কিছু বেশি। হিকমাতের কথা বললেই হাকীম লোকমানের কথা আমাদের মানসপটে ভেসে ওঠে। তিনি নবী ছিলেন কি না– এ বিষয়ে বিতর্ক থাকলেও তিনি যে একজন হাকীম ছিলেন এটা কুরআন স্বীকৃত। স্বয়ং আল্লাহ বলেন : 'আমি লোকমানকে হিকমাত (প্রজ্ঞা) দান করেছি...।'[১] আবার এটাও বলেছেন : 'যাকে হিকমাত দান করা হয় সে প্রভূত কল্যাণ প্রাপ্ত হয়।'[২] আর প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মাদ (সা.) বলেছেন : 'হিকমাতের মূলকথা হল মহামহীম আল্লাহর ভয়।'[৩]

প্রজ্ঞা হল এমন এক পূর্ণতার নাম যা মানুষের পবিত্র ও চিরন্তন জীবন নিশ্চিত করে। একে 'ইল্‌মে এলাহী' তথা 'খোদায়ী জ্ঞান'ও বলা হয়। কেননা, তাওহীদ (একত্ববাদের) অঙ্গনে খোদায়ী জ্ঞান ফেরেশতাদের মতোই মহান আল্লাহর একত্ববাদের সাক্ষী হয়। পবিত্র কুরআনে এসেছে : 'আল্লাহ সাক্ষ্য দিয়েছেন যে, তিনি ছাড়া আর কোন ইলাহ্ নেই। ফেরেশতাগণ এবং ন্যায়নিষ্ঠ জ্ঞানিগণও সাক্ষ্য দিয়েছেন যে, তিনি ছাড়া আর কোন ইলাহ্ নেই।'[৪] এ আয়াতে আল্লাহ ও ফেরেশতাকুলের সাক্ষ্যের পরে 'খোদায়ী জ্ঞানে জ্ঞানীদের' সাক্ষ্য স্থান পেয়েছে একত্ববাদের ব্যাপারে। যদি আল্লাহর পরিচিতি জ্ঞান এবং তাঁর একত্ববাদের প্রতি সাক্ষ্য ও তাঁর প্রতি ভীতি মানুষের নিজের থেকে হয় তাহলে সে 'জান্নাতু আদ্‌ন' বা চিরন্তন জান্নাতি নিবাস[৫] লাভ করবে, আর যদি আল্লাহর একত্ববাদের প্রতি সাক্ষ্য ও তাঁর প্রতি ভীতি হয় আক্‌লগত ও উৎকৃষ্ট (প্রজ্ঞা) তাহলে সে উপরিউক্ত বেহেশত ছাড়াও 'জান্নাতুল লিকা'ও লাভ করবে।

অতএব, প্রবেশ কর আমার আবেদদের মধ্যে এবং প্রবেশ কর আমার জান্নাতে।'[৬] এমন লোক উভয় জান্নাতেরই অধিকারী হয় : 'যে ব্যক্তি তার প্রতিপালকের মাকামের ভয় করে তার জন্য রয়েছে দু'টি জান্নাত।'[৭]

এ কথাগুলো বলা হল প্রজ্ঞার বিষয়টি কিছুটা সহজ করে বোঝার জন্য। বিশেষ করে প্রজ্ঞা কীভাবে প্রভূত কল্যাণের কারণ হয়, কুরআনের সে বক্তব্যটি বোঝার জন্য। এ প্রবন্ধের শিরোনাম হল 'প্রজ্ঞাময় আলী বিন আবি তালিব (আ.)'। শিরোনাম দেখামাত্রই আলী-প্রেমিকদের চিন্তা ধাবিত হতে পারে মহানবী (সা.)-এর সেই বিখ্যাত হাসীদের দিকে। যেখানে তিনি বলেছেন : 'আমি জ্ঞানের নগরী, আর আলী তার দরজা।' কিন্তু এতো গেল হযরত আলীর জ্ঞানের কথা। তাহলে তাঁর প্রজ্ঞার কথা কে বলবে? আসলে তাঁর প্রজ্ঞার পরিচয় জানার জন্য স্বয়ং তাঁকেই একটু নতুন করে চেনার অবকাশ রয়েছে। তাই মূল আলোচনায় অবতীর্ণ হওয়ার আগে আমীরুল মুমিনীন ইমামুল মুত্তাকীন আলী বিন আবি তালিবের সাথে আরও একবার পরিচিত হয়ে নেয়া যাক।

আলী বিন আবি তালিব (আ.)-কে জানার জন্য তাঁর নিজের ভাষ্যেরও যেমন, তেমনি তাঁর আদর্শের শিষ্যবৃন্দের বক্তব্যেরও সাহায্য গ্রহণ করা যায়। এ মহান ইমাম নিজের সম্বন্ধে এমন কিছু বিশেষণ ব্যবহার করেছেন (নাহ্জুল বালাগায় যা গ্রন্থিত হয়েছে) তা থেকে তাঁর উন্নত প্রজ্ঞাময় মর্যাদার সন্ধান মেলে।

ইমলামের সেই ঊষালগ্নে প্রিয়নবী (সা.)-এর প্রশংসায় ইমাম বলেন : 'রাসূলুল্লাহ (সা.) আমার শৈশবকালে আমাকে তাঁর কোলে তুলে লালন-পালন করতেন। প্রতি দিনই তিনি আমার জন্য তাঁর জ্ঞান ও চরিত্রের একটি করে দরজা সামনে খুলে দিতেন। আর প্রতি বছরে যখন হেরা পর্বতের গুহায় দিনাতিপাত করতেন এবং সেখানে বসে ইবাদাতে নিমগ্ন হতেন তখন আমিই (শুধু) তাঁকে দেখতাম, আর আমি ছাড়া দ্বিতীয় কেউ তাঁকে দেখতে পেত না। সেদিন ইসলাম আবির্ভূত (যেসব গৃহে ইসলাম প্রবেশ করেছিল) গৃহের (পরিবারের) মধ্যে শুধু রাসূলুল্লাহ (সা.) ও খাদীজা (আ.)-এর পর আমি ব্যতীত (তৃতীয় কোন ব্যক্তি) ছিল না। আমি ওহী ও রেসালাতের নূর অবলোকন করতাম এবং নবুওয়াতের সুঘ্রাণযুক্ত মৃদুবায়ু আমার নাসিকায় এসে পৌঁছত।'[৮]

হযরত ইউসুফ (আ.) সম্পর্কে কুরআনের কাহিনীতে রয়েছে যে, যখন তাঁর ভাইয়েরা মিসর থেকে তাঁর জামাসহ বাড়ির দিকে রওয়ানা হয় তখন কয়েক ফারসাখ দূর থেকেই হযরত ইয়াকুব (আ.) দৃঢ়তার সাথে ও সংশয়ের ঊর্ধ্বে উঠে বলেন : 'আমি নিশ্চিতরূপেই ইউসুফের গন্ধ পাচ্ছি।'[৯]

যে ঘ্রাণ অদৃশ্য থেকে গ্রহণ করে সেটা জাগতিক ও বস্তুগত ঘ্রাণ নয়। নবুওয়াতও কোন জাগতিক ও বস্তুগত বিষয় নয়। এ কারণে এ বহিরাঙ্গের নাসিকা দ্বারা এ ঘ্রাণ নেয়া যায় না। এজন্য প্রয়োজন উর্ধ্বলোকীয় ঘ্রাণেন্দ্রিয়।

হযরত আলী বিন আবি তালিব (আ.) বলেন : 'আমি ওহী ও নবুওয়াতের নূরও অবলোকন করি, নবুওয়াতের ঘ্রাণও গ্রহণ করি।' অতঃপর বলেন : 'ওহী নাযিলের দিনে আমি শয়তানের আর্তনাদ শুনতে পাই। তখন বলি : হে রাসূলুল্লাহ্ (সা.)! এ আর্তনাত কিসের? তিনি (সা.) বললেন : এ হল শয়তানের আফসোসের আর্তনাদ। সে বুঝতে পেরেছে যে, এখন থেকে আর পূজিত হবে না।'[১০]

যেখানে ওহী, নবুওয়াত ও রেসালাতের শাসন থাকে সেখানে মানুষ শয়তানের ইবাদত করে না। শয়তানের এ আফসোস ও ক্রন্দন তার নিরাশারই প্রতীক। সে নিরাশ হয়ে পড়েছে যে, আর পূজিত হবে না। অতঃপর বললেন : 'হে আলী! যা কিছু আমি দেখতে পাই, তুমিও তা দেখতে পাও। আর যা কিছু আমি শুনতে পাই, তুমিও তা শুনতে পাও। শুধু পার্থক্য হল তুমি নবী নও। তবে তুমি আমার উজির (সাহায্যকারী) এবং নিশ্চয় তুমি কল্যাণের ওপরে প্রতিষ্ঠিত।'[১১]

প্রকৃতপক্ষে হযরত আলীর পরিচয় তুলে ধরতে রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এরই কথা বলার প্রয়োজন।

এবার স্বয়ং ইমাম আলী নিজের উচ্চতার উপমা টেনেছেন এভাবে: 'আমার থেকেই বর্ষার ঢল গড়িয়ে নেমে আসে, আর কোন পাখি উড়ে গিয়ে আমার শীর্ষে পৌঁছায় না।'[১২]

বাক্যটি 'নাহজুল বালাগা'র বিখ্যাত খুতবা 'শিকশীকিয়্যাহ'র অন্তর্গত।

ইমাম বলছেন : 'আমি হলাম ঐ উন্নত-শির পর্বতসম। যার ওপর থেকে জ্ঞানের ঢল নির্ঝরিণীর মতো বেয়ে পড়ে। আর কোন উড়ন্ত বাজ (পাখি)-ই উড়ে আমার শীর্ষে পৌঁছতে পারে না। সাধারণ চিন্তাশক্তির অধিকারীরা হযরত আলীর উচ্চ মর্যাদা

অনুধাবন করতে সক্ষম নয়। আবার এই খোদায়ী জ্ঞানের আধার প্রজ্ঞাময়ের শীর্ষদেশ থেকে বন্যার ঢলের মতো যে জ্ঞানস্রোত নেমে আসে তা বহন করার সাধ্যও সাধারণ লোকদের নেই। কারণ, প্রচণ্ড গতিতে ধেয়ে আসা ঢলের স্রোতের সামনে সবাই দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না। তাই তো ইমাম তাঁর জ্ঞানের পরিধি তুলে ধরে অবারিত ঘোষণায় বলেছেন : 'হে লোকসকল! আমাকে হারাবার আগে তোমরা আমাকে জিজ্ঞাসা কর। আমি জমিনের পথসমূহের অপেক্ষা আসমানের পথসমূহ বেশি চিনি।'[১৩]

এ ঘোষণায় ইমাম নিজের জন্য দু'টি জগৎ তথা দু'টি জন্মের ইশারা করেছেন। যেমনভাবে বিশ্বজাহানেরও দু'টি জগতের কথা উল্লেখ করেছেন : জাহেরি (বাহ্যিক জগৎ) ও বাতেনী (অন্তর্জগৎ)। দৃশ্যমান জগৎ ও অদৃশ্য জগৎ। তিনি বলেছেন : 'আমার অদৃশ্য দিকটি দৃশ্যমান দিকের চেয়ে বেশি শক্তিশালী। জমিনের জ্ঞানের তুলনায় আসমানের জ্ঞান আমার অনেক বেশি।' কারণ, অদৃশ্যলোক দৃশ্যলোকের তুলনায় বেশি শক্তিশালী। যে জিনিস অদৃশ্যলোকের সাথে সম্পৃক্তি লাভ করে সে দৃশ্যলোকের সাথে সম্পৃক্তি লাভ করা জিনিসের তুলনায় বেশি শক্তিশালী। ইমাম বলেছেন : 'আমি আসমানের পথসমূহ জমিনের পথসমূহের চেয়ে বেশি চিনি।'

অন্যত্র তিনি আরও বলেন : 'আল্লাহর কসম, আমি যদি তোমাদের এক-একজনের অতীত ও ভবিষ্যৎ এবং সকল বিষয়ে সংবাদ দিতে চাই তাহলে পারি (কারণ, আল্লাহর অনুমতিক্রমে আমি অদৃশ্যলোকের জ্ঞানের অধিকারী)। কিন্তু ভয় হল হয়তো তোমরা সহ্য করতে পারবে না এবং বলে বসবে যে, আলী বিন আবি তালিব রাসূলুল্লাহ্ (সা.) থেকে বড়। কেননা, রাসূলুল্লাহ (সা.) এরূপ বলেননি, কিন্তু আলী বলছেন। ফলে বিষয়টি তোমাদের চিন্তার স্খলন ঘটাবার কারণ হতে পারে। তবে আমার অনুসারীদের থেকে যারা আমার নির্ভরযোগ্য তাদের সাথেই জগতের কিছু রহস্য-কথা আমি বলব।'[১৪]

এ হল আলী বিন আবি তালিবের অদৃশ্য জগৎ সম্পর্কে জ্ঞান নয়, প্রজ্ঞার এক নমুনা। তিনি বলেন : 'পবিত্র কুরআন যা আল্লাহর কালাম, এর মধ্যে রয়েছে জগতের সব রহস্যকথা। তবে কথা বলে না। আমি কুরআনকে ব্যক্ত করি এবং নিজেকে ওহীর মুখপাত্র হিসাবে তুলে ধরছি।' তিনি বলেন : 'কুরআন কথা বলে না। তোমরা কুরআনকে জিজ্ঞাসা কর। সে কথা বলে না। আমিই হলাম কুরআনের মুখপাত্র।

আমিই কুরআনের পক্ষ থেকে কথা বলি। আমিই কুরআনকে কথা বলাই। ভবিষ্যতের জ্ঞান, অতীতের কথা, ঝুট-ঝামেলার বিচার এবং তোমাদের জীবনের সমস্ত বিষয় রয়েছে এ কুরআনে।'[১৫]

স্বয়ং আল্লাহপাক এ কুরআনের ওজন সম্পর্কে এভাবে উপমা দিয়েছেন : 'যদি আমি এ কুরআন পাহাড়ের ওপরে অবতীর্ণ করতাম, তবে তুমি দেখতে পেতে যে, পাহাড় বিনীত হয়ে আল্লাহর ভয়ে বিদীর্ণ হয়ে গেছে।'[১৬]

এ কুরআন এতই ভারী যে, যদি পর্বতের ওপরে তা অবতীর্ণ হয় তাহলে পর্বত চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাবে। ঠিক যেমন কিছু কিছু কঠিন বিষয় বোঝা কারও কারও জন্য সহজ হয় না। হয়তো তার মাথায় যন্ত্রণা সৃষ্টি হয় কিম্বা সে তা অনুধাবন করতে পারে না। তদ্রূপ কুরআনের ভারী বিষয়বস্তু বহন করতে কঠিন পর্বতেরও বিগড়ে যাবার উপক্রম হয়। কুরআনের নিজের ওজন বুঝতে এ সুন্দর উপমার অনুকরণে হযরত আলী বিন আবি তালিবও তাঁর মারেফাত ও ভালবাসার ওজন একটি উপমার সাহায্যে তুলে ধরেন। যখন সাহ্‌ল বিন হুনাইফ আনসারী হযরত আলী (আ.)-এর দীর্ঘদিনের এ ঘনিষ্ট সহচর ও শিষ্য মৃত্যুবরণ করেন, তখন আলী (আ.) বলেন : 'যদি পাহাড়ও চায় আমার ভালবাসাকে হজম করতে তাহলে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাবে।'[১৭]

অর্থাৎ, আমার ভালবাসার ভার সহ্য করার সাধ্য পর্বতের নেই। আলীর বেলায়াত কুরআনের মহান বাণীর মতোই বহন করা সহজসাধ্য নয়।

এ আলী একটি মুহূর্তকালের জন্যও হক্ বা সত্য সম্পর্কে সংশয় পোষণ করেননি। তিনি বলেন : 'যে মুহূর্ত থেকে সত্যকে আমার সামনে দেখানো হয়েছে তখন থেকেই আমি এতে কোন সন্দেহ করিনি।'[১৮]

এর কারণ হিসাবে তিনি বলেছেন : 'কেননা, আমি ফিতরাতের ওপরে জন্মগ্রহণ করেছি।'[১৯]

এ প্রসঙ্গে হযরত আলী (আ.) তাঁর নিজের ব্যাপারে আরও কিছু রহস্যের দরজা উন্মোচন করে বলেন : 'আমি হলাম সেই দলভুক্ত যার অন্তর রয়েছে বেহেশতে, আর শরীর আমলে রত। আমাদের চিহ্ন হল সিদ্দিকীন (সত্যবাদীদের) চিহ্ন।' যারা (অন্তরের) বিশ্বাসেও সততাপূর্ণ, কর্ম ও চরিত্রেও সততাপূর্ণ। এ তিনটি ক্ষেত্রে (অর্থাৎ

বিশ্বাস, চরিত্র ও আমল) তারা সর্বপ্রকার সংশয় ও দ্বিধার ঊর্ধ্বে এক বিশুদ্ধ অবস্থানে বিচরণশীল ।

'এদের কথা হল আবরার তথা পুণ্যবানদের বাণী; আর এরা রাতের সমৃদ্ধকারী এবং দিনের আলো বিচ্ছুরণকারী ।'

রাতের সমৃদ্ধকারী অর্থাৎ বিনিদ্র রাত যাপনকারী । সমৃদ্ধের বিপরীত হল বিনষ্ট । যারা নিদ্রায় রাত কাটিয়ে দেয় তাদের রাতটা বিনষ্টই হল । কিন্তু যারা বিনিদ্র রাত যাপন করে, ঘুমন্ত দুনিয়ায় সে জেগে থাকে । কবির ভাষায় : রাতের ক্রন্দন আর প্রত্যুষের কৃতজ্ঞতা এক ফোঁটা বৃষ্টি দানার মতো যা আসলে বৃষ্টি নয়, একটি মুক্তা দানা । এ মুক্তা যে অর্জন করল তার রাত বিনষ্ট নয়, সমৃদ্ধ হল । আর স্বাভাবিক দিনে সে হেসে উঠবেই, আলো ছাড়াবেই । প্রকৃতিতে আলো ছড়ায় সূর্য । আর মানব সমাজে আলো ছড়ায় আল্লাহ্‌র এসব আউলিয়া ।

'এরা কুরআনের রজ্জু আঁকড়ে থাকে, আর আল্লাহ্‌ ও তাঁর রাসূলের সুন্নাতসমূহ ভালবাসে ।'

অর্থাৎ আমি হলাম সেই দলভুক্ত যারা আল্লাহ ও রাসূলের সুন্নাতসমূহকে পুনরুজ্জীবিত করে এবং খোদায়ী বিধি-বিধানকে বাঁচিয়ে (প্রতিষ্ঠিত) রাখে ।

অতঃপর তিনি বলেন : 'এরা অহঙ্কারী নয়, শ্রেষ্ঠত্বের দাবীতে মাতামাতি করে না, সীমালঙ্ঘন করে না এবং অশান্তি করে না । এদের অন্তরগুলো থাকে বেহেশতে, আর শরীরগুলো আমলে ব্যস্ত ।'[২০]

অর্থাৎ এরা এখনই বেহেশতে রয়েছে । তাদের দেহগুলো এখানে যখন আমলে রত । একই সময়ে তাদের অন্তরগুলো বেহেশতে নেয়ামতসিক্ত ।

হযরত আলী (আ.) বলেন : 'আমি একটি মুহূর্তের জন্য আল্লাহ কিম্বা তাঁর রাসূলের (নির্দেশ) প্রত্যাখ্যান করিনি । বরং নিরঙ্কুশভাবে তাঁদের আনুগত্য করেছি । প্রতিটি ক্ষণে ওহীর নির্দেশিত পথে চলেছি । ওহীর পথ থেকে কখনই দূরে সরে যাইনি ।' তাইতো আলী (আ.) এ খুতবা সমাপ্ত করেন দৃঢ় আস্থার সাথে এ দাবী রেখে যে : 'কসম সেই খোদার, যিনি ছাড়া কোন ইলাহ্‌ নেই । নিশ্চয় আমি সত্যের ওপরে প্রতিষ্ঠিত । আর যারা বিরোধিতাকারী তারা নিশ্চয় বাতিল (মিথ্যার) খাদের কিনারায় ।

তোমরা যা শুনলে এটাই আমার কথা এবং আমি আল্লাহর কাছে তোমাদের জন্য ও আমার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করি ।'[২১]

এ পর্যন্ত হযরত আলী (আ.)-এর নিজের জবানীতে তাঁর প্রজ্ঞাময় ব্যক্তিত্ব ও মর্যাদা তুলে ধরার চেষ্টা করলাম। এবার তাঁর আদর্শের শিষ্যদের বক্তব্য থেকে কিছু আলোচনা করা যাক ।

ইমাম আলী বিন আবি তালিব (আ.)-এর আদর্শের ভাবশিষ্যরাও তাঁর বিজ্ঞান ও প্রজ্ঞাময় ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে অনেক কথা বলেছেন। সিকাতুল ইসলাম মরহুম কুলায়নী (র.) হলেন তাঁদের অন্যতম। তিনি তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'আল-কাফী'র জন্য গোটা মুসলিম জাহানে সুপরিচিত ও শ্রেষ্ঠ মনীষী। তিনি এ গ্রন্থের 'জাওয়ামিউত তাওহীদ' অধ্যায়ে হযরত আলী (আ.)-এর 'তাওহীদ' খুতবাটি উদ্ধৃত করেছেন। ইমাম এ খুতবার মধ্যে জনগণকে মু'আবিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধে আহ্বান জানাবার আগে স্বীয় স্রষ্টার সাথে আলাপনে রত হন এভাবে : 'সকল প্রশংসা আল্লাহর যিনি এক ও অদ্বিতীয়, স্বয়ংসম্পূর্ণ ও... এভাবে আমি আমার প্রতিপালকের গুণ বর্ণনা করি। সুতরাং আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ্ নেই ।'[২২]

এ খুতবাটি হযরত আলী (আ.)-এর 'খুতবা-ই তাওহীদ' নামে প্রসিদ্ধ। সাইয়্যেদ রাযী নাহজুল বালাগায় অন্তর্ভুক্ত করার আগে মরহুম কুলায়নি তাঁর মূল্যবান গ্রন্থ 'উসূলে কাফি'র মধ্যে এটি বর্ণনা করেছেন। এ খুতবা বর্ণনা করার পর তিনি বলেন, 'তাওহীদের বিষয়ে যদি কেউ চিন্তাশীল ও গবেষণাপ্রবণ হয় তাহলে এ খুতবাটি নিয়ে চিন্তা ও অনুধ্যান করলেই যথেষ্ট ছিল। তাহলে দেখতে পেত তাওহীদের গভীরতম বিষয়গুলো এর মধ্যে নিহিত রয়েছে।' অতঃপর বলেন : 'যদি সকল জিন ও ইনসান একসাথে হয় এবং মানব সমাজের সকল পণ্ডিত-বুদ্ধিজীবী একত্র হন (নবীরা ব্যতীত) যারা সাধারণ পথে জ্ঞান-বিজ্ঞানের উচ্চস্তরে আরোহণ করেছেন ।

তাঁরা যদি আল্লাহর তাওহীদ (একত্ববাদ) সম্পর্কে বক্তব্য রাখতে চান তাহলে কখনই এ বিষয়ে আলী বিন আবি তালিব (আ.)-এর বক্তব্যের সমকক্ষ বক্তব্য রাখতে পারবেন না ।'[২৩]

বর্তমান যুগের শ্রেষ্ঠ আরেফ ও দার্শনিক আয়াতুল্লাহ্ জাওয়াদি আমুলি মরহুম কুলায়নীর বক্তব্যকে উল্লেখ করে বলেন[২৪] : 'কুলায়নীর এ কথাটি অনেকটা চ্যালেঞ্জ

ছুঁড়ে দেবার মতো ঘটনা। যেমন চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দেয়া হয়েছে কুরআনের ব্যাপারে এ আয়াতের মধ্যে : 'বলুন, যদি মানব ও জীন এই কুরআনের অনুরূপ রচনা করে আনার জন্য জড়ো হয় এবং তারা পরস্পরের সাহায্যকারী হয়, তবুও তারা কখনও এর অনুরূপ রচনা করে আনতে পারবে না।'[২৫]

হযরত আলী (আ.)-এর আদর্শের অন্যতম ভাবশিষ্য হলেন ইবনে আবিল হাদীদ মুতাযেলী। তিনি মুতাযেলী মাযহাবের অনুসারী হয়েও হযরত আলী (আ.)-এর মুখনিঃসৃত বাণীমালার সৌন্দর্যে মোহিত হয়ে নাহজুল বালাগা গ্রন্থের বিশদ ব্যাখ্যা রচনা করেছেন। নাহজুল বালাগার ২২১ নং খুতবাটি হযরত আলী (আ.) 'সূরা তাকাছুর' এর প্রথম দু'টি আয়াত : 'প্রাচুর্যের লালসা তোমাদের গাফেল রাখে, এমনকি (এভাবেই) তোমরা কবরস্থানে পৌঁছে যাও'[২৬]– প্রসঙ্গে বিবৃত করেন। এ খুতবার শেষাংশে ইমাম বলেন : 'মৃত্যু মানুষের অস্তিত্বের ওপর এতই কর্তৃত্ববান হয় এবং তাকে গ্রাস করে ফেলে যা বর্ণনার ভাষা নেই। জ্ঞানীদের বুদ্ধিবৃত্তি 'মৃত্যু' নামক প্রপথটির সঠিক ব্যাখ্যা প্রদান করতে অপারগ।'

এ খুতবার আরেকটি অংশে ইমাম বলেন : 'এরা রাতেই সফর করুক, আর রাত্রিকালীন সফরেই মৃত্যুবরণ করুণ কিম্বা দিনের বেলায় সফর করুক, আর দিনের বেলাতেই মৃত্যুবরণ করুক না কেন, অনন্তকালীন হবে।'

ইবনে আবিল হাদীদ এ খুতবার ব্যাখ্যায় বলেন : 'এ খুতবাটি বিস্ময়কর এক গভীরতা ও গুঢ় রহস্যের দ্বারা পরিপূর্ণ এবং এমন সব বিশুদ্ধ ও জটিল ভাষাসমৃদ্ধ যে, যদি কেউ নাহজুল বালাগার এ অংশটি পর্যালোচনা করে তাহলে উপলব্ধি করবে যে, মু'আবিয়ার আলী বালাগাতকে (ভাষার অলঙ্কারিত্বকে) কুরাইশের জন্য ভিত্তি স্থাপন করে গেছেন'– এ কথাটি সম্পূর্ণ সঠিক।' অতঃপর ইবনে আবিল হাদীদ বলেন : 'যদি আরবের সকল বিশুদ্ধ ভাষী পণ্ডিত একত্র হন এবং তাঁদের সামনে এ খুতবা পাঠ করা হয় তাহলে তাঁরা সবাই সিজদায় মাটিতে লুটিয়ে পড়বেন। যেমনভাবে কুরআনে কিছু আয়াত রয়েছে যা পাঠ করার পরে সিজদায় যেতে হয়, আলী বিন আবি তালিবের তদ্রূপ কিছু খুতবা রয়েছে যেগুলো যদি বুদ্ধিজীবী, ভাষাতত্ত্ববিদ ও ভাষায় অলঙ্কার ও বিশুদ্ধতায় বিশেষজ্ঞজনদের সামনে পাঠ করা হয় তাহলে তাঁদের সিজদায় যাওয়া উচিত। আর এ খুতবা হল তেমনই একটি খুতবা।[২৭]

আয়াতুল্লাহ জাওয়াদী আমুলী বলেন : ইবনে আবিল হাদীদের এহেন মন্তব্যের বিষয়টি আল্লামা তাবাতাবাঈ (র.)-এর ক্লাসে উত্থাপন করা হয়। তখন এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন : 'ইবনে আবিল হাদীদ অবান্তর বলেননি। কারণ, যদি সিজদার প্রসঙ্গ থাকে তাহলে সেটা আল্লাহর কালামের জন্যই। আর ঐ কুরআনী বিষয়বস্তুই তো খুতবারূপে আলী (আ.) থেকে নিঃসৃত হয়েছে। তাই প্রকৃতপক্ষে সিজদা হল খোদায়ী বাণীর জন্যই, তাঁর সৃষ্টির বাণীর জন্য নয়।'[২৮]

ইবনে আবিল হাদীদ কসম করে বলেন : 'সেই সূচনা উৎসের কসম, যাঁর নামে সকল উম্মত কসম করে থাকে। আমি এ খুতবাটি পঞ্চাশ বছর আগে থেকে এ পর্যন্ত সহস্রাধিক বার পাঠ করেছি এবং প্রত্যেক বারই যখন পাঠ করেছি আমার কাছে নতুন লেগেছে। আর নতুন বিষয় ও নতুন এক উপদেশ আমার অন্তরে উদয় হয়েছে।'[২৯]

প্রবন্ধটি গুছিয়ে আনতে চাই ইসলামের মহাপণ্ডিত ও দার্শনিক ইবনে সিনা (র.)-এর রেসালাতু মি'রাজিয়া' শীর্ষক রচনা কর্মের একটি বক্তব্য দ্বারা। রাসূলুল্লাহ (সা.) হযরত আলী (আ.)-এর 'আকল' ও 'প্রজ্ঞা' সম্পর্কে একটি বাণীতে বলেন : 'হে আলী! লোকেরা যখন বিভিন্ন রকম পুণ্যকর্ম দ্বারা আল্লাহর নৈকট্য লাভের প্রয়াস চালাবে, তখন তুমি আকলের মাধ্যমে তাঁর নৈকট্য লাভ কর, (দেখবে) তুমি তাদের অগ্রবর্তী হবে।'

ইবনে সিনার বিখ্যাত দর্শন গ্রন্থ হল 'আশ-শিফা'। এ গ্রন্থের ব্যাখ্যাকারীরা 'রেসালাতু মি'রাজিয়া'র এ হাদীসটির উদ্ধৃতি টেনে বলেছেন : 'অপরাপর সাহাবীর সাথে আলী বিন আবি তালিব (আ.)-এর তুলনা হল দেহের পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের সাথে মস্তিকের তুলনার ন্যায়। অর্থাৎ তিনি হলেন আকল (বুদ্ধি), আর অন্যরা হলেন ইন্দ্রিয়। ইন্দ্রিয়সমূহ বুদ্ধির মুখাপেক্ষী। আর বুদ্ধি হল ইন্দ্রিয়সমূহের পথ-নির্দেশক নেতা।

প্রজ্ঞাময়ের চূড়ান্ত পরিচয় প্রকাশ পায় তার পরিণাম দর্শনে। পবিত্র কুরআনে এসেছে : 'যদি দাবী কর তোমরাই আল্লাহর আউলিয়া– অন্য কোন মানব নয়, তবে মৃত্যু কামনা কর...।'[৩০]

আলী বিন আবি তালিব নিজের সম্পর্কে বলেন : 'আমি মৃত্যুর প্রতি আসক্ত। কারণ, এমন এক জগতে পৌঁছে যাব যেখানে নিরবচ্ছিন্ন সত্য বিরাজমান, বাতিলের কোনই আনা-গোনা সেখানে নেই। সেখানে সত্য রয়েছে, মিথ্যা তার মধ্যে নেই।

কিন্তু দুনিয়ায় সত্য এর মিথ্যার সাথে এবং ন্যায় এর অন্যায়ের সাথে মিশ্রিত। তাই আমার জন্য মৃত্যুর চেয়ে পছন্দনীয় আর কিছুই নেই।' তিনি মৃত্যুর প্রতি তাঁর এ আকর্ষণকে মাতৃস্তনের প্রতি দুগ্ধপোষ্য শিশুর আকর্ষণের সাথে তুলনা করেছেন। কিন্তু পার্থক্য হল শিশুর আকর্ষণ শিশুসুলভ। আর হযরত আলীর আকর্ষণ প্রজ্ঞাপ্রসূত।

যতই বয়স বৃদ্ধি পায় এ আকর্ষণ ততই তীব্রতা লাভ করে। যে ব্যক্তি মৃত্যুকে ভয় করে সে কি নিরাপদ থাকে? কখনই নয়। যে মৃত্যুকে ভয় করে সে যেমন নিরাপদ নয়। আর যে চিরকাল বাঁচতে চায় মৃত্যু তেমনি তাকে বাঁচার অনুমতি দেয় না।

কিন্তু ব্যতিক্রম হযরত আলী। সম্ভবত প্রজ্ঞাময়ের সর্বোৎকৃষ্ট পরিশীলিত উক্তি এটি যে, তিনি বলেন : 'যদি শাহাদাতের লালসা ও আল্লাহর দিদার লাভের আসক্তি না থাকত তাহলে আমি কখনই কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে যেতাম না এবং তাদেরকে আমি দেখতেও রাজি ছিলাম না। এই যে আমি তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের অপেক্ষায় থাকি, তার কারণ, আমি শাহাদাতের পিয়াসী।'[৩১]

কুরআনের উপর্যুক্ত আয়াতের পাশে হযরত আলী বিন আবি তালিবের এ উক্তি রেখে পর্যবেক্ষণ করলে অনায়াসে প্রতীয়মান হয় যে, প্রজ্ঞাময় আলী বিন আবি তালিব আল্লাহর আউলিয়াকুল শিরোমনি।

তথ্যসূত্র

১. সূরা লোকমান : ১২;
২. সূরা বাকারা : ২৬৯;
৩. মান লা ইয়াহ্দুরুহুল ফাকীহ, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ২৭২;
৪. সূরা আলে ইমরান : ১৮;
৫. সূরা বাইয়্যেনাহ : ৮;
৬. সূরা ফাজ্র : ২৯-৩০;
৭. সূরা রাহমান : ৪৬;
৮. নাহজুল বালাগা, খুতবা নং ১৯২;
৯. সূরা ইউসুফ : ৯৪;
১০. নাহজুল বালাগা, খুতবা নং ১৯২;

১১. প্রাগুক্ত;
১২. প্রাগুক্ত, খুতবা নং ৩;
১৩. প্রাগুক্ত, খুতবা নং ১৮৯;
১৪. প্রাগুক্ত, খুতবা নং ১৭৫ (ভাবার্থ)
১৫. প্রাগুক্ত, খুতবা নং ১৫৮, অনুচ্ছেদ ২;
১৬. সূরা হাশর, আয়াত নং ২২;
১৭. নাহজুল বালাগা, হিকমাত নং ১১১;
১৮. প্রাগুক্ত, হিকমাত নং ১৮৪;
১৯. প্রাগুক্ত, খুতবা নং ৫৭, অনুচ্ছেদ ২;
২০. হযরত আলী (আ.)-এর ভাষণের এ অংশগুলো নাহজুল বালাগার ১৯২ নং খুতবা থেকে উৎকলিত হয়েছে।
২১. প্রাগুক্ত।
২২. উসূলে কাফি, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৩৬, বাব জাওয়ামিউত তাওহীদ, হাদীস নং ১;
২৩. প্রাগুক্ত
২৪. Ayatullah Jawadi Amoli: The Theoritical & Practical Philosophy in Nahjul Balagha, P. 49
২৫. সূরা বনি ইসরাইল : ৮৮;
২৬. সূরা তাকাছুর : ১-২;
২৭. শারহে ইবনে আবিল হাদীদ, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৫১;
২৮. Ayatullah Jawadi Amoli: The Theoritical & Practical Philosophy in Nahjul Balagha, P. 51
২৯. শারহে ইবনে আবিল হাদীদ, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৫১;
৩০. সূরা জুমআ : ৬;
৩১. শেষ কথাগুলো নাহজুল বালাগা গ্রন্থে বর্ণিত হযরত আলী (আ.)-এর খুতবা (খুতবা নং ১৮০, ৫ ও ৩৮) থেকে নেয়া ভাবার্থ।

বেহেশতের নারীদের নেত্রী হযরত ফাতিমা (আ.)

মো. আশিফুর রহমান

ভূমিকা

আমরা যারা মুসলমান তাদের নানা ধরনের সমস্যা রয়েছে। আমরা জানি না যে, আমরা কেন মুসলমান, ইসলাম ধর্ম কেন শ্রেষ্ঠ ধর্ম, আল্লাহ তা'আলার প্রেরিত নবী-রাসূলগণ কেমন ছিলেন, আমরা কেন তাঁদের মেনে চলব অথবা আমরা কাদের মতো হব ইত্যাদি। আমরা এগুলো সম্পর্কে যথাযথভাবে চিন্তা-ভাবনা করি না বলেই মনে হয়।

আমরা আমাদের ছেলেমেয়েদের বিভিন্ন জিনিস শেখাই। কাউকে গান শেখাই, কাউকে নাচ, কাউকে অভিনয়, কাউকে খেলাধুলা আবার কাউকে অন্য কিছু। অর্থাৎ গায়ক, নৃত্যশিল্পী, অভিনয় শিল্পী তৈরি করছি। বিশেষ করে নাচের ব্যাপারে বলা যায় যে, প্রাচীনকালে রাজা-বাদশারা তাদের বিনোদনের জন্য সঙ্গী-সাথী নিয়ে একটি ঘরের মধ্যে যে নাচ দেখতো সেটাই আমরা টিভিতে, মঞ্চে দেখতে পাচ্ছি। অর্থাৎ আমরা কন্যাসন্তানদের যেন এক একজন নর্তকী বানাচ্ছি। ভদ্র ভাষায় যাকে 'নৃত্যশিল্পী' বলা হচ্ছে।

যদি আমরা কোন ছোট ছেলে বা মেয়েকে জিজ্ঞেস করি, তুমি বড় হয়ে কী হতে চাও। সে উত্তর দেয় যে, অমুক গায়কের মতো, অমুক নায়কের মতো, অমুক নৃত্যশিল্পীর মতো, অমুক খেলোয়াড়ের মতো হতে চাই। কেউ কি কখনও বলেছে, আমি রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর মতো জীবন যাপন করতে চাই, বিশ্বের নারী জাতির আদর্শ হযরত ফাতিমা (আ.)-এর মতো হতে চাই। না, কদাচিৎ হয়ত তা শোন যায়। এটি তাদের দোষ নয়। এর জন্য আমরাই দায়ী।

আমরা আমাদের সন্তানদের ছোট থেকেই অনেক গায়ক, নায়ক, খেলোয়াড়ের সাথে পরিচিত করিয়েছি। কিন্তু রাসূলুল্লাহ্ (সা.) কিংবা হযরত ফাতিমা (আ.)-এর সাথে যেভাবে পরিচয় করানো উচিত ছিল সেভাবে পরিচয় করাইনি।

আমরা হয়ত হযরত ফাতিমার নাম বলেছি, মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সা.)-এর মেয়ে হিসাবে তাঁর পরিচয় দিয়েছি। কিন্তু কতটুকু এ পরিচয়? আমরা নিজেরাই হয়ত তাঁর সঠিক পরিচয় জানি না। তাহলে কীভাবে অন্যদের কাছে তাঁর পরিচয় তুলে ধরব? বংশ পরম্পরায় না আমাদের জীবন তাঁদের মতো, আর না আমাদের সন্তানদের জীবন।

হযরত ফাতিমা (আ.) রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর মেয়ে। কিন্তু এর চেয়ে বড় পরিচয় হল হযরত ফাতিমা হলেন বেহেশতের নারীদের নেত্রী। আর এটিই তাঁর আসল পরিচয়।

আমরা জানি যে, কেবল আত্মীয়তার সম্পর্ক থাকলেই যে কেউ বেহেশতে যেতে পারবে না। যদি নবী-রাসূলগণের স্ত্রী-সন্তানও হয় তবুও না। হযরত নূহ (আ.)-এর স্ত্রী-সন্তান এবং হযরত লূত (আ.)-এর স্ত্রী জাহান্নামবাসী হয়েছে, এটি পবিত্র কুরআনেই বর্ণিত হয়েছে।

সূরা তাহরীমের ১০ নং আয়াতে বলা হয়েছে :

ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱمۡرَأَتَ نُوحٖ وَٱمۡرَأَتَ لُوطٖۖ كَانَتَا تَحۡتَ عَبۡدَيۡنِ مِنۡ عِبَادِنَا صَٰلِحَيۡنِ فَخَانَتَاهُمَا فَلَمۡ يُغۡنِيَا عَنۡهُمَا مِنَ ٱللَّهِ شَيۡـٔٗا وَقِيلَ ٱدۡخُلَا ٱلنَّارَ مَعَ ٱلدَّٰخِلِينَ ١٠

আল্লাহ্ অবিশ্বাসীদের জন্য নূহের স্ত্রী ও লূতের স্ত্রীর দৃষ্টান্ত উপস্থিত করেছেন, তারা আমার বান্দাদের মধ্যে দুই সৎকর্মপরায়ণ বান্দার অধীন ছিল। কিন্তু তারা তাদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল। ফলে তারা (নূহ ও লূত) তাদের আল্লাহ্র (শাস্তি) থেকে তাদের রক্ষা করতে পারল না এবং তাদের বলা হল, 'তোমরা উভয়ে প্রবেশকারীদের সাথে জাহান্নামে প্রবেশ প্রবেশ কর।'

অপরদিকে নূহ (আ.)-এর পুত্র সম্পর্কে পবিত্র কুরআনের সূরা হূদের ৪২-৪৩ নং আয়াতে বলা হয়েছে :

وَنَادَىٰ نُوحٌ ٱبْنَهُۥ وَكَانَ فِى مَعْزِلٍ يَٰبُنَىَّ ٱرْكَب مَّعَنَا وَلَا تَكُن مَّعَ ٱلْكَٰفِرِينَ ﴿٤٢﴾ قَالَ سَـَٔاوِىٓ إِلَىٰ جَبَلٍ يَعْصِمُنِى مِنَ ٱلْمَآءِ ۚ قَالَ لَا عَاصِمَ ٱلْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ ٱللَّهِ إِلَّا مَن رَّحِمَ ۚ وَحَالَ بَيْنَهُمَا ٱلْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ ٱلْمُغْرَقِينَ

'...নূহ তার পুত্রকে, যে তার থেকে পৃথক স্থানে ছিল, আহ্বান করে বলল, 'হে আমার বৎস! আমাদের সঙ্গে আরোহণ কর এবং অবিশ্বাসীদের সঙ্গী হয়ো না।' সে বলল, 'অতিসত্বর আমি কোন পর্বতে আশ্রয় গ্রহণ করব যা আমাকে (প্লাবনের) পানি হতে রক্ষা করবে।' সে (নূহ) বলল, 'আজ আল্লাহর (শাস্তির) আদেশ থেকে পরিত্রাণ দানের কেউ নেই, তবে তিনি (আল্লাহ) যার প্রতি অনুকম্পা করেন।' সহসা তাদের (পিতা-পুত্রের) মধ্যস্থলে তরঙ্গ প্রতিবন্ধক হয়ে গেল এবং সে নিমজ্জিতদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেল।'

এ আয়াতগুলো থেকে বোঝা যায়, প্রত্যেককে আল্লাহর নির্দেশিত পথে জীবন যাপন করেই বেহেশতে প্রবেশ করতে হবে। আল্লাহর বিরোধিতা করে কেউ বেহেশতে যেতে পারবে না। এমনকি যদি রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর স্ত্রী-সন্তান হন, তবুও তাঁরা কেবল এ সম্পর্কের ভিত্তিতে বেহেশতে যেতে পারবেন না। যেমনটি বলা হয়েছে সূরা আহযাবের ৩০ নং আয়াতে :

يَٰنِسَآءَ ٱلنَّبِىِّ مَن يَأْتِ مِنكُنَّ بِفَٰحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ يُضَٰعَفْ لَهَا ٱلْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ ۚ وَكَانَ ذَٰلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا ﴿٣٠﴾

'হে নবীপত্নিগণ! তোমাদের মধ্যে যে কেউ প্রকাশ্য অশ্লীল আচরণ করবে তার শাস্তি দ্বিগুণ বৃদ্ধি করা হবে এবং এটা আল্লাহর পক্ষে অতি সহজ।'

যা হোক, হযরত ফাতিমা মাত্র ১৮ বা ২০ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন। যদিও এ নিয়ে মতেভেদ রয়েছে। কিন্তু তাঁর সর্বোচ্চ জীবনকাল ৩০ বছর পর্যন্ত বলা হয়ে থাকে। যেটাই হোক না কেন, এ সময়ের মধ্যে তিনি এমন কী কাজ করেছেন যার জন্য রাসূলুল্লাহ্ (সা.) তাঁকে 'বেহেশতবাসী নারীদের নেত্রী' বলে অভিহিত করলেন– এ প্রশ্নটি আমাদের মনে আসাটাই স্বাভাবিক। আর এ বিষয়টি অবশ্যই বোঝা যায়

যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) নিজের খেয়াল-খুশীমতো তাঁকে এমন অভিধায় অভিহিত করেননি। কারণ, তিনি প্রবৃত্তির বশবর্তী হয়ে কোন কথা বলেন না।[১] আর এ থেকে আমরা বলতে পারি, হযরত ফাতিমা (আ.) ইসলামের জন্য বড় খেদমত আঞ্জাম দিয়েছেন, মহান আল্লাহ্র রাসূল (সা.) এজন্যই তাঁকে ভালবাসতেন এবং তাঁকে অনুসরণ করার জন্য আমাদের নির্দেশ দিয়ে গিয়েছেন। কিন্তু এ বিষয়টি আমাদের অনেকেরই জানার বাইরে রয়ে গেছে। আমরা এ বিষয়ে উদাসীন থেকেছি।

হযরত ফাতিমা (আ.)-এর সংক্ষিপ্ত জীবনী তুলে ধরার জন্যই এ প্রবন্ধের অবতারণা।

হযরত ফাতিমার জন্মগ্রহণ

রাসূলুল্লাহ (সা.) চল্লিশ বছর বয়সে নবুওয়াতপ্রাপ্ত হন। এরপর মহান আল্লাহর নির্দেশে গোপনে তিন বছর মানুষকে ধর্মের দিকে দাওয়াত দিতে থাকেন। তিন বছর পর তিনি প্রকাশ্যে নিজের আত্মীয়-স্বজন ও মক্কাবাসীকে ধর্মের পথে দাওয়াত দেন। রাসূলের গোত্র বনু হাশিমের মধ্য থেকে তাঁর চাচা আবু লাহাব তাঁর বিরোধিতা করতে থাকে। আর মক্কার নেতৃস্থানীয় কুরাইশরা সকলে রাসূলের সাথে শত্রুতা শুরু করে।

এর মধ্যে রাসূলের পুত্রসন্তানরা মারা গেলে কাফির-মুশরিকরা রাসূলকে নিয়ে ঠাট্টা করতে থাকে। আস ইবনে ওয়ায়েল রাসূলকে 'আবতার' (লেজকাটা) বা নির্বংশ বলে গালি দেয়। সে বলত, 'আরে মুহাম্মাদের তো কোন পুত্রসন্তান নেই, সে মরে গেলে তার নাম নেয়ার মতো ও কেউ থাকবে না।' রাসূলুল্লাহ্ (সা.) এ কথায় খুব কষ্ট পেতেন। মহান আল্লাহ্ তাঁর এ কষ্ট দূর করার জন্য যে অমূল্য নেয়ামত তাঁকে দান করেন তিনিই হলেন হযরত ফাতিমা (আ.)। এর প্রেক্ষিতেই পবিত্র কুরআনের সূরা কাওসার নাযিল হয়।

আল্লামা ফখরুদ্দীন রাযী তাঁর তাফসীর গ্রন্থে বলেন, হযরত ফাতিমার শানে এ সূরা নাযিল হয়েছে। তিনি এ প্রসঙ্গে আরও বলেন, অনেক অত্যাচার সত্ত্বেও হযরত ফাতিমার বংশধারা পৃথিবীতে টিকে আছে, অন্যদিকে বনু উমাইয়্যা ধ্বংস হয়ে গেছে।

এর সাথে আমরা বলতে চাই, পরবর্তী কালে বনু আব্বাসও রাসূলের পরিবারের প্রতি নিষ্ঠুর নির্যাতন চালিয়েছিল। অবশেষে তারাও ধ্বংস হয়ে গেছে। যারা রাসূলের বিরুদ্ধে কথা বলত তাদের বংশধরদের কোন খবর পৃথিবীর মানুষ জানে না, নেয় না।

রাসূলের বংশধরদের নিশ্চিহ্ন করার জন্য সকল ধরনের চেষ্টা করেও তারা সফল হয়নি। আবু জেহেল, আবু সুফিয়ানরা চেয়েছিল রাসূলকে হত্যা করতে, আবু সুফিয়ানের সন্তান আমীরে মুআবিয়া চেয়েছিল হযরত আলীকে হত্যা করতে, তার রাজত্বকালেই ইমাম হাসানকে বিষ প্রয়োগে হত্যা করা হয়, মুআবিয়ার ছেলে ইয়াযীদ কারবালায় নৃশংসভাবে ইমাম হুসাইনকে সপরিবারে শহীদ করে। পরবর্তীকালে একের পর এক রাসূলের বংশধরকে হত্যা করা হয়। তারপরও যারা পুত্রসন্তান নিয়ে গর্ব বোধ করত তাদের কোন খবর আজ বিশ্ববাসী জানে না, অথচ রাসূলের বংশধারা হযরত ফাতিমার মাধ্যমে কিয়ামত পর্যন্ত বজায় থাকবে। এ বংশধারাতেই শেষ জামানায় ইমাম মাহদী (আ.) আবির্ভূত হবেন এবং তিনি সারা বিশ্বে আল্লাহর ধর্মকে প্রতিষ্ঠিত করবেন। সেদিন আল্লাহ তা'আলার সেই ঘোষণার বাস্তবায়ন হবে যা তিনি সূরা তওবায় বলেছেন :

هُوَ ٱلَّذِىٓ أَرۡسَلَ رَسُولَهُۥ بِٱلۡهُدَىٰ وَدِينِ ٱلۡحَقِّ لِيُظۡهِرَهُۥ عَلَى ٱلدِّينِ كُلِّهِۦ وَلَوۡ كَرِهَ ٱلۡمُشۡرِكُونَ ﴿٣٣﴾

'তিনি তো সেই সত্তা যিনি তাঁর রাসূলকে পথনির্দেশ ও সত্যধর্মসহ প্রেরণ করেছেন, যাতে সেটিকে (নিজ ধর্মকে) সমুদয় ধর্মের ওপর বিজয়ী করেন; যদিও অংশীবাদীরা তা অপছন্দ করে।'[২]

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, 'সকল নারীর সন্তানদের তাদের পুরুষদের সাথে সংযুক্ত করা হয় শুধু ফাতিমা ব্যতীত। ফাতিমার সন্তানদের আমার সাথে সম্পর্কিত করা হয়েছে।'[৩]

আর সেজন্যই আমরা ইতিহাসে দেখতে পাই যে, হযরত ফাতিমার সন্তানদের মানুষ 'ইয়াবনা রাসূলিল্লাহ' অর্থাৎ হে রাসূলের সন্তান বলে সম্বোধন করত।

যা হোক, হযরত ফাতিমার জন্মের মাধ্যমে রাসূল অপরিসীম মানসিক শান্তি অনুভব করেন। তিনি তাঁকে কতটা ভালবাসতেন তা তাঁর কথায় বারবার প্রকাশিত হয়েছে। এ ভালবাসা অকারণ ছিল না। হযরত ফাতিমার তাকওয়া, তাঁর দুনিয়াবিমুখতা, তাঁর দায়িত্বশীলতা সব মিলিয়ে মহান আল্লাহর কাছে তাঁর যে অবস্থান সে কারণেই রাসূলুল্লাহ (সা.) তাঁকে ভালবাসতেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর কাছে হযরত ফাতিমা

আগমন করলে তিনি তাঁকে দাঁড়িয়ে সম্ভাষণ জানাতেন।[৪] এটি কি শুধু একজন কন্যার প্রতি পিতার ভালবাসার বহিঃপ্রকাশ ছিল? আলেমগণ বলেছেন, কখনই নয়। কারণ, অন্য কোন সন্তানের ক্ষেত্রে রাসূল এমন কাজ করতেন না। প্রকৃতপক্ষে এ ছিল বেহেশতের নারীদের নেত্রীর প্রতি মহান আল্লাহ্‌র রাসূলের সম্মান বা ভালবাসা প্রদর্শন।

হযরত ফাতিমার জন্মকালীন নারী জাতির অবস্থা

হযরত ফাতিমা এমন এক সময় জন্মগ্রহণ করেন যখন সারা বিশ্বে নারীদের মানুষ বলে গণ্য করা হত না। তাদেরকে নানাভাবে নির্যাতন করা হত। খ্রিস্টানরা নারীকে 'শয়তানের দোসর' বলত এবং তাকে সব পাপের উৎস বলে মনে করত। আরবরা কন্যাসন্তান জন্মগ্রহণ করলে তাকে জীবন্ত কবর দিত।

পবিত্র কুরআনে সেই জাহেলীয়াতের যুগের কথা এভাবে বর্ণিত হয়েছে :

وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِٱلْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُۥ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ ﴿٥٨﴾ يَتَوَٰرَىٰ مِنَ ٱلْقَوْمِ مِن سُوٓءِ مَا بُشِّرَ بِهِۦٓ ۚ أَيُمْسِكُهُۥ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُۥ فِى ٱلتُّرَابِ ۗ أَلَا سَآءَ مَا يَحْكُمُونَ ﴿٥٩﴾

'আর যখন তাদের কাউকে কন্যাসন্তানের সুসংবাদ দেয়া হয় তখন তার মুখ কালো হয়ে যায়, অসহ্য মনস্তাপে ক্লিষ্ট হতে থাকে। তাকে শোনানো সুসংবাদের দুঃখে সে লোকদের থেকে মুখ লুকিয়ে থাকে। সে ভাবে তাকে অপমান সহ্য করে থাকতে দেবে, না তাকে মাটিতে পুঁতে ফেলবে।'[৫]

হযরত ফাতিমা সেই অবস্থায় জন্মগ্রহণ করেন। রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর মাধ্যমে আল্লাহ নারী জাতিকে মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত করেন। রাসূলুল্লাহ (সা.) প্রথমে তাঁর স্ত্রী হযরত খাদীজার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে নারী জাতিকে সম্মানিত করেন। পরে স্বীয় কন্যা ফাতিমার প্রতি দায়িত্ব পালন করেও নারীদের মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করেন।

কোন কোন রেওয়ায়েতে হযরত ফাতিমার জন্মগ্রহণের সময় বেহেশতী নারীর আগমনের উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায়। হযরত খাদীজা বলেন, 'ফাতিমার

জন্মগ্রহণের সময় সাহায্য করার জন্য আমি কুরাইশ নারীদের ডেকে পাঠিয়েছিলাম। তারা এ বলে প্রত্যাখ্যান করল যে, আমি মুহাম্মাদকে বিয়ে করেছি। আমি কিছুক্ষণের জন্য দুঃশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়েছিলাম। হঠাৎ দেখলাম চারজন উজ্জ্বল জ্যোতির্ময় দীর্ঘকায়া বিশিষ্ট নারী আমার দিকে এগিয়ে আসছেন। আমাকে আতংকিত দেখে তাঁরা বললেন : হে খাদীজা! ভয় পাবেন না। আমি হলাম ইসহাকের মা সারা, আর অপর তিনজন হলেন ঈসার মা মারইয়াম, ফিরআউনের স্ত্রী আছিয়া এবং মূসার বোন উম্মে কুলসুম। আল্লাহ আমাদের পাঠিয়েছেন আপনাকে সাহায্য করতে। এ বলে সেই জ্যোতির্ময় নারীরা আমার চারপাশ ঘিরে বসলেন। আমার মেয়ে ফাতিমা জন্মগ্রহণ করা পর্যন্ত তাঁরা আমার সেবা করলেন।'[৬]

হযরত ফাতিমার নামকরণ

মহান আল্লাহ্‌র নির্দেশে মহানবী (সা.) তাঁর কন্যাসন্তানের নাম রাখেন ফাতিমা। 'ফাত্‌ম' শব্দের অর্থ রক্ষা করা। আর তাঁর এমন নামকরণ সম্পর্কে মহানবী বলেন : 'তার নামকরণ করা হয়েছে ফাতিমা। কেননা, আল্লাহ তাকে ও তার অনুসারীদের জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্ত রেখেছেন।'[৭]

হযরত ফাতিমার শৈশবকাল

সর্বশ্রেষ্ঠ নবী ও রাসূল (সা.) ও বেহেশতী নারী হযরত খাদীজার গৃহে হযরত ফাতিমা জন্মগ্রহণ করলেন। সবচেয়ে সম্মানিত গৃহ। অথচ পার্থিব দিকে থেকে খুব কষ্টকর একটি গৃহে তিনি জন্ম নিলেন। যখন হযরত খাদীজার সাথে রাসূলের বিয়ে হয় তখন হযরত খাদীজা ছিলেন আরবের অন্যতম ধনাঢ্য ব্যক্তিত্ব। কিন্তু অসহায় মানুষদের সেবা ও নিপীড়িত মুসলমানদের পেছনে ব্যয় করতে গিয়ে তিনি শোচনীয় অবস্থায় নিপতিত হন।

ধর্ম প্রচারের কারণে রাসূলের ওপর কুরাইশরা নানাভাবে নির্যাতন শুরু করে। এভাবে হযরত ফাতিমার দুই বছর অতিক্রান্ত হয়। হযরত ফাতিমার জন্মের মাত্র দুই বছর পর তাঁরা সবচেয়ে কঠিন অবস্থায় পড়েন। বনু হাশিমের সাথে কুরাইশরা সকল

সম্পর্ক ছিন্ন করার ঘোষণা দেয়। তখন বনু হাশিমের নেতা ছিলেন হযরত আবু তালিব। তিনি বনু হাশিমকে নিয়ে শেবে আবি তালিবে (আবু তালিবের গিরিগুহা) আশ্রয় নেন।

দিনের পর দিন তাঁদেরকে না খেয়ে থাকতে হত। এতে মহিলাদের বুকের দুধ শুকিয়ে যায়। সন্তানরা দুধ না পেয়ে কেঁদে কেঁদে ঘুমিয়ে যেত। হযরত ফাতিমা শিশু বয়সেই এমন এক অবস্থার মধ্যে পড়েন। দীর্ঘ তিন বছর তাঁরা এ অবস্থার মধ্যে কাটান। অবশেষে তিন বছর পর তাঁরা এ অবরোধ থেকে বেরিয়ে আসেন। কিন্তু বৃদ্ধ বয়সে এতো কষ্ট সহ্য করার পর সেই বছরই হযরত ফাতিমার প্রাণপ্রিয় মা ইন্তেকাল করেন। যে বয়সে তাঁর মাতৃস্নেহের প্রয়োজন, যে বয়সে তাঁর লালিত-পালিত হওয়ার কথা সে বয়সেই তাঁর ওপর রাসূলের দেখাশুনার গুরুদায়িত্ব এসে পড়ে। তখন তাঁর বয়স ছিল মাত্র পাঁচ। তিনি রাসূলকে মায়ের মতোই যত্ন করতেন, তাঁর দিকে খেয়াল রাখতেন। শুধু ঘরের মধ্যে নয়, ঘরের বাইরেও তিনি রাসূলের বিষয়াদির প্রতি লক্ষ্য রাখতেন। অন্যান্য শিশুর মতো তিনি খেলাধুলা করতেন না। সেই ছোট বেলাতেই তিনি একজন দায়িত্বশীল নারীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। যখনই তিনি জেনেছেন যে, কাফির-মুশরিকরা রাসূলকে নির্যাতন করছে, তখনই তিনি সেখানে ছুটে গেছেন এবং পিতাকে উদ্ধার করে এনেছেন। একবার আবু জেহেল ও তার সঙ্গীরা রাসূলের সিজদাবনত অবস্থায় মাথার ওপর উটের নাড়িভূঁড়ি চাপিয়ে দেয়। যখন হযরত ফাতিমা এ ঘটনার কথা শোনেন তখনই তিনি দৌড়ে সেখানে চলে যান এবং পিতার মাথার ওপর থেকে সেগুলো সরিয়ে ফেলেন। তিনি আবু জেহেলকে এজন্য তিরস্কার করতে থাকেন।

তিনি রাসূলের প্রতি এতটাই যত্নশীল ছিলেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা.) তাঁকে 'উম্মু আবিহা' (তার পিতার মা) বলে আখ্যায়িত করেন।[৮]

মদীনায় হিজরত

ইসলাম প্রচারের ত্রয়োদশ বর্ষে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সা.) মহান আল্লাহ্‌র নির্দেশে মদীনায় হিজরত করেন। তাঁর হিজরত করার সময় হযরত ফাতিমা মক্কাতেই

অবস্থান করছিলেন। কয়েকদিন পর হযরত আলী (আ.) হযরত ফাতিমা ও বনু হাশিমের আরও কয়েকজন নারীসহ হিজরত করেন।

পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ নারীর বিয়ের বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া

দ্বিতীয় হিজরীতেই হযরত ফাতিমার সাথে হযরত আলীর বিয়ে হয়। তাঁর বিয়ের বিষয়ে ইতিহাসে যে বর্ণনা পাওয়া যায় তাতে তাঁর মর্যাদা আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে যায়। হযরত আবু বকর, হযরত উমর, হযরত উসমান এবং আরও অনেক খ্যাতনামা সাহাবী হযরত ফাতিমাকে বিয়ে করার জন্য রাসূলের কাছে প্রস্তাব দেন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (সা.) তাঁদের কারও প্রস্তাবই গ্রহণ করেননি। তিনি বলেন, 'ফাতিমার বিয়ে মহান আল্লাহর নির্দেশে সম্পন্ন হবে।' হযরত আবদুর রহমান ইবনে আওফ রাসূলের কাছে গিয়ে বলেন, 'যদি ফাতিমাকে আমার সাথে বিয়ে দেন, তাহলে মূল্যবান মিশরীয় কাপড় বোঝাই ১০০০টি উট এবং সেসঙ্গে ১০০০ দিনার (স্বর্ণমুদ্রা) মোহরানা হিসাবে প্রদান করব।' রাসূল (সা.) এ প্রস্তাবে খুব অসন্তুষ্ট হন এবং বলেন, 'তুমি কি মনে করেছ আমি অর্থ ও সম্পদের গোলাম? তুমি সম্পদ ও অর্থ দিয়ে আমার সাথে বড়াই করতে চাও?'[৯]

হযরত ফাতিমার বিয়ে প্রসঙ্গে রাসূল (সা.) বলেন, 'আল্লাহর ফেরেশতা আমার নিকট এসে বললেন, আল্লাহ আপনাকে সালাম জানিয়েছেন এবং বলেছেন, তিনি আপনার কন্যা ফাতিমাকে আসমানে আলী ইবনে আবি তালিবের সাথে বিয়ে দিয়েছেন। সুতরাং আপনিও তাঁকে জমিনে তাঁর সাথে বিয়ে দিন।'[১০]

রাসূলুল্লাহ (সা.) পরবর্তীকালে বলেন, 'আলীর জন্ম না হলে ফাতিমার সুযোগ্য স্বামী পাওয়া যেত না।'[১১]

বিয়ের সময় হযরত ফাতিমার বয়স ছিল মাত্র দশ-এগারো বছর। অথচ এ বয়সেই রাসূল বলছেন, 'আলীর জন্ম না হলে ফাতিমার সুযোগ্য স্বামী পাওয়া যেত না।' এ কথার মধ্যে কত বড় রহস্য লুকিয়ে ছিল তা পরবর্তীকালে প্রকাশিত হয়েছে।

ইসলামের জন্য হযরত আলী (আ.)-এর ত্যাগ সম্পর্কে আমরা জেনেছি। বদর, উহুদ, খন্দক, খায়বার, যাতুস সালাসিল, হুনায়ুন প্রভৃতি যুদ্ধে তাঁর অতুলনীয়

অবদানের কথা ইতিহাসের পাতায় পাতায় লেখা রয়েছে। অন্যদিকে তিনিই হলেন রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর জ্ঞানের ভাণ্ডার। একইভাবে রাসূলুল্লাহ (সা.) ও হযরত আলীর ভরসাস্থল হযরত ফাতিমার অবদানও আমরা দেখেছি। তিনি রাসূলের ওফাতের পর ক্রান্তিকালে মানুষকে সত্যের দিকে আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি তাঁর ভূমিকার মাধ্যমে সত্যের আলো প্রজ্বলিত করেই এ পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছেন। তাঁর প্রসিদ্ধ দু'টি ভাষণ[১২] আমাদের হেদায়াতের পথনির্দেশ করে। তাই আমরা বুঝতে পারি কেন রাসূল সেই দশ বছরের বালিকা ও বাইশ বছরের যুবক সম্পর্কে এ কথা বলেছিলেন!

বিয়ে পরবর্তী জীবনে রাসূলের সান্নিধ্য

বিয়ের পরও হযরত ফাতিমা রাসূলের সেবায় নিয়োজিত থাকতেন। তাঁর ঘর থেকে রাসূলের ঘর বেশি দূর ছিল না। তিনি সবসময় রাসূলের খবর নিতেন। রাসূলুল্লাহ (সা.)ও একইভাবে হযরত ফাতিমার খোঁজ-খবর নিতেন। প্রতিদিন প্রভাতে মসজিদে যাওয়ার পূর্বে রাসূল (সা.) হযরত ফাতিমার সাথে দেখা করতেন। নাফে বর্ণনা করেন, 'আমি আট মাস মদীনায় বসবাস করেছিলাম। তখন প্রতিদিন রাসূল (সা.)-কে দেখতাম যখন তিনি ফজর নামায আদায়ের জন্য ঘরের বাইরে আসতেন তখন সর্বপ্রথম ফাতিমার দরজার সন্নিকটে গিয়ে বলতেন :

ٱلسلام عليكُم يا أهلَ ٱلبيت و رحمةُ اللهِ و بركاته، ٱلصلاةُ، إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ ٱلرِّجْسَ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ﴿٣٣﴾

'হে আহলে বাইত! তোমাদের প্রতি সালাম এবং আল্লাহ্র রহমত ও বরকত (বর্ষিত হোক)। নামাযের সময় হয়েছে। হে আহলে বাইত! নিশ্চয়ই আল্লাহ্ চান তোমাদের থেকে সকল পাপ-পঙ্কিলতা দূর করতে এবং তোমাদের সম্পূর্ণরূপে পবিত্র করতে।'[১৩]

কোন সফরে বা যুদ্ধে যাওয়ার সময় রাসূল সবশেষে হযরত ফাতিমার কাছ থেকে বিদায় নিতেন। আবার মদীনায় ফিরে সর্বপ্রথম তিনি হযরত ফাতিমার সাথে সাক্ষাৎ করতেন।

যুদ্ধক্ষেত্রে সেবিকার ভূমিকায়

হিজরতের প্রথম বছর মোটামুটি নির্বিঘ্নে কাটলেও দ্বিতীয় বছর থেকেই আবার কঠিন পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়। মক্কার কাফির-মুশরিকরা মুসলমানদের সাথে একের পর এক যুদ্ধে লিপ্ত হয়। প্রতিনিয়ত শংকার মধ্য দিয়ে দিন অতিবাহিত হতে থাকে।

যুদ্ধের ময়দানেও হযরত ফাতিমা রাসূলের সেবায় নিয়োজিত হন। উহুদের যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ (সা.) আহত হলে তিনি যুদ্ধের ময়দানে ছুটে চলে যান। তিনি পিতার মুখমণ্ডল ধুয়ে দেন এবং খেজুরের ডাল ভস্মিভূত করে ক্ষতস্থানে লাগিয়ে দেন।

রাসূলের প্রতি ভালবাসার দু'টি নমুনা

খন্দকের যুদ্ধের পূর্বে রাসূল (সা.) একদিন পরিখা খননের কাজে ব্যস্ত ছিলেন, হযরত ফাতিমা একটি রুটি তাঁর জন্য নিয়ে আসেন। রাসূল (সা.) জিজ্ঞাসা করেন, 'এটি কী?' ফাতিমা বলেন, 'সন্তানদের জন্য কয়েকটি রুটি বানিয়েছিলাম। সেখান থেকে একটি আপনার জন্য নিয়ে এসেছি।' রাসূল বলেন, 'হে ফাতিমা! এটাই প্রথম খাদ্য যা তিন দিন পর তোমার পিতার নিকট পৌঁছেছে।'

তিনি তাঁর ছোট ছোট সন্তানদের ওপরও রাসূলকে প্রাধান্য দিতেন। প্রতিবেশীরা খাবার পাঠালে তিনি রাসূলকে সঙ্গে না নিয়ে তাদরেকে সে খাবার খেতে দিতেন না। এভাবে রাসূলের ওফাত পর্যন্ত আমরা তাঁকে একজন মমতাময়ী মায়ের ভূমিকায় পাই যিনি সত্যিই 'উম্মু আবিহা' (স্বীয় পিতার মাতা)। এ উপাধি তিনি পিতার ক্ষেত্রে মায়ের ভূমিকা পালনের কারণেই পেয়েছিলেন। রাসূল (সা.) যখনই তাঁর নিকট আসতেন যেন মায়ের সান্নিধ্য পেতেন ও তাঁর সকল কষ্ট দূরীভূত হত। রাসূল (সা.)-এর ওপর ইসলাম প্রচারের যে গুরুদায়িত্ব ছিল ও এ পথে যত চাপ অনুভব করতেন ফাতিমার মাতৃস্নেহে রাসূল তা ভুলে যেতেন। বিশেষত হযরত আবু তালিব ও খাদিজার মৃত্যুর পর রাসূলের একাকিত্বে তিনি ছিলেন তাঁর পিতার সবচেয়ে বড় মানসিক প্রশান্তি।

সন্তান প্রতিপালনে হযরত ফাতিমা

যদি সুযোগ্য তত্ত্বাবধানে সন্তানরা লালিত-পালিত হয় তাহলে ধর্ম প্রচারের কাজ কতই না সহজ হয়ে যায়! এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ হযরত ফাতিমা। হযরত ফাতিমার বিয়ের দুই বছরের মধ্যেই ইমাম হাসান ও ইমাম হুসাইন জন্মগ্রহণ করেন। হযরত আলী

নিশ্চিন্তে হযরত ফাতিমার ওপর সন্তান লালন-পালনের ভার দিয়ে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সাথে বেরিয়ে পড়তেন হয়ত কোন সফরে, না হয় কোন যুদ্ধে। আর হযরত ফাতিমা একাকী কত বড় দায়িত্বই না পালন করলেন! তিনি কীভাবে গড়ে তুললেন এ সন্তানদের? রাসূলের দুই নাতি তথা আল্লাহর তলোয়ার আলী মুর্তাজার দুই সন্তানকে তিনি গড়ে তুললেন 'বেহেশতের যুবকদের নেতা' রূপে।

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, 'হাসান ও হুসাইন বেহেশতের যুবকদের নেতা।'[১৪]

হ্যাঁ, এ নেতাদের গড়ে তুলেছেন বেহেশতেরই নারীদের নেত্রী হযরত ফাতিমা যাহরা (আ.)। হযরত ফাতিমা দুইজন অতুলনীয় ব্যক্তিত্ব গড়ে তুললেন পরবর্তীকালে ইসলামের জন্য যাঁদের অবদান মুসলমানরা উপলব্ধি করতে পেরেছে। ইমাম হাসান এক মহাসংকটকালে সন্ধির মাধ্যমে ইসলামকে রক্ষা করেন। আর ইমাম হুসাইন ইসলামের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্যই কারবালার মরুপ্রান্তরে নিজের পরিবার-পরিজনসহ শাহাদাত বরণ করেন।

অথচ তাঁরাই হলেন রাসূলের পরিবার– রাসূলের আহলে বাইত পথভ্রষ্টতা থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য রাসূলুল্লাহ্ (সা.) যাঁদেরকে পবিত্র কুরআনের পাশাপাশি আঁকড়ে ধরার নির্দেশ দিয়েছেন। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, 'হে লোকসকল! নিশ্চয় আমি তোমাদের মাঝে এমন জিনিস রেখে গেলাম তোমরা তা ধারণ করলে কখনও পথভ্রষ্ট হবে না : আল্লাহর গ্রন্থ (আল কুরআন) এবং আমার ইতরাত (আহলে বাইত)।'[১৫]

অপর একটি হাদীসে বলা হয়েছে : 'এ দু'টি কখনও বিচ্ছিন্ন হবে না কাওসার নামক ঝর্নায় আমার সাথে উপস্থিত না হওয়া পর্যন্ত। অতএব, তোমরা লক্ষ্য কর আমার পরে এতদুভয়ের সাথে তোমরা কীরূপ আচরণ করবে।'[১৬]

হযরত ফাতিমার মর্যাদা

১. পবিত্র কুরআনে

পবিত্র কুরআনের অনেক আয়াতে হযরত ফাতিমার মর্যাদার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এর মধ্যে কয়েকটি এখানে উল্লেখ করা হল।

ক. সূরা আহযাবের নিম্নোক্ত আয়াতে হযরত ফাতিমাকে নিষ্পাপ বলে ঘোষণা করা হয়েছে :

إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ ٱلرِّجْسَ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ﴿٣٣﴾

রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর পোষ্য উমার ইবনে আবু সালামা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উম্মে সালামা (রা.)-এর ঘরে নবী (সা.)-এর ওপর এ আয়াত নাযিল হয় (অনুবাদ) : হে নবী-পরিবার! আল্লাহ তো চান তোমাদের থেকে অপবিত্রতা দূর করতে এবং তোমাদেরকে সম্পূর্ণরূপে পবিত্র করতে। তখন নবী (সা.) ফাতিমা, হাসান ও হুসাইনকে ডাকেন এবং তাদেরকে একখানা চাদরে ঢেকে নেন। আলী তাঁর পেছনে ছিলেন। তিনি তাঁকেও চাদরে ঢেকে নেন। অতঃপর বলেন : হে আল্লাহ্! এরা আমার আহলে বাইত। অতএব, তুমি তাদের থেকে অপবিত্রতা দূর করে দাও এবং তাদেরকে উত্তমরূপে পবিত্র কর। তখন উম্মে সালামা বলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমিও কি তাদের অন্তর্ভুক্ত? তিনি বলেন, তুমি স্বস্থানে আছ এবং তুমি কল্যাণের মধ্যেই আছ।[১৭]

একই রকম হাদীস হযরত আয়েশা হতেও বর্ণিত হয়েছে।[১৮]

খ. সূরা আলে ইমরানের ৬১ নম্বর আয়াত অনুযায়ী (আয়াতে মোবাহিলায়) হযরত ফাতিমাকে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) তাঁর নবুওয়াতের সত্যতার সাক্ষী করেছেন। পবিত্র কুরআনের সেই আয়াতটি হল :

فَمَنْ حَآجَّكَ فِيهِ مِنۢ بَعْدِ مَا جَآءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا۟ نَدْعُ أَبْنَآءَنَا وَأَبْنَآءَكُمْ وَنِسَآءَنَا وَنِسَآءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَل لَّعْنَتَ ٱللَّهِ عَلَى ٱلْكَـٰذِبِينَ ﴿٦١﴾

'অতঃপর তোমার নিকট যখন জ্ঞান (কুরআন) এসে গেছে, এরপরও যদি কেউ (খ্রিস্টান) তোমার সাথে তার (ঈসার) সম্বন্ধে তর্ক-বিতর্ক করে, তবে বল, '(ময়দানে) এস, আমরা আহ্বান করি আমাদের পুত্রদের এবং তোমাদের পুত্রদের, আমাদের নারীদের এবং তোমাদের নারীদের, এবং আমাদের সত্তাদের এবং তোমাদের

সত্তাদের;' অতঃপর সকলে মিলে (আল্লাহর দরবারে) নিবেদন করি এবং মিথ্যাবাদীদের ওপর আল্লাহর অভিসম্পাত বর্ষণ করি।'

ঘটনাটি এরূপ : নাজরান থেকে আগত খ্রিস্টান প্রতিনিধি দলের সাথে যখন মোবাহিলা (পারস্পরিক অভিশাপ বর্ষণ) করার জন্য মহান আল্লাহ্ রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে নির্দেশ দিয়েছিলেন তখন তিনি হযরত ফাতিমা, হযরত আলী, ইমাম হাসান ও ইমাম হুসাইনকে সাথে নিয়ে উন্মুক্ত প্রান্তরে উপস্থিত হয়েছিলেন। কুরআনে বর্ণিত পুত্রদের স্থানে তিনি নিজের দুই নাতি ইমাম হাসান ও হুসাইনকে, নারীদের স্থানে নিজ কন্যা হযরত ফাতিমাকে এবং 'সত্তা' বলে গণ্যদের স্থানে হযরত আলীকে নিলেন এবং দো'আ করলেন, 'হে আল্লাহ! প্রত্যেক নবীর আহলে বাইত থাকে, এরা আমার আহলে বাইত। এদের সকল দোষ-ত্রুটি হতে মুক্ত ও পাক-পবিত্র রেখ।' তিনি এভাবে ময়দানে পৌঁছলে খ্রিস্টানদের নেতা আকব তা দেখে বলল, 'আল্লাহর কসম, আমি এমন নূরানী চেহারা দেখছি যে, যদি এ পাহাড়কে নিজ স্থান হতে সরে যেতে বলেন, তবে অবশ্যই সরে যাবে। সুতরাং মুবাহিলা হতে হাত গুটিয়ে নেওয়াই কল্যাণকর, অন্যথায় কিয়ামত অবধি খ্রিস্টানদের কেউ অবশিষ্ট থাকবে না।' পরিশেষে তারা জিযিয়া কর দিতে সম্মত হল।[১৯] এভাবে হযরত ফাতিমা তাঁর পিতার নবুওয়াতের সপক্ষে সাক্ষ্য প্রদান করলেন।

গ. সূরা দাহরে হযরত ফাতিমা ও তাঁর পরিবারের প্রশংসা করা হয়েছে এভাবে :

وَيُطْعِمُونَ ٱلطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِۦ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا ﴿٨﴾ إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ ٱللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَآءً وَلَا شُكُورًا ﴿٩﴾ إِنَّا نَخَافُ مِن رَّبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا ﴿١٠﴾ فَوَقَىٰهُمُ ٱللَّهُ شَرَّ ذَٰلِكَ ٱلْيَوْمِ وَلَقَّىٰهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا ﴿١١﴾ وَجَزَىٰهُم بِمَا صَبَرُوا۟ جَنَّةً وَحَرِيرًا ﴿١٢﴾

'তারা তাঁর (আল্লাহ্র) ভালবাসায় অভাবগ্রস্ত, অনাথ ও বন্দীকে আহার্য দান করে। এবং বলে, 'কেবল আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে আমরা তোমাদেরকে আহার প্রদান করি, আমরা তোমাদের নিকট হতে প্রতিদান চাই না, কৃতজ্ঞতাও নয়, আমরা আশংকা করি আমাদের প্রতিপালকের নিকট হতে এক ভীতিপ্রদ দিনের, সেদিন

মুখমণ্ডল বিকৃত ও বিবর্ণ হয়ে যাবে'; পরিণামে আল্লাহ তাদের সেদিনের কঠিন পরিস্থিতি হতে রক্ষা করবেন এবং তাদের দান করবেন উৎফুল্লতা ও আনন্দ। আর ধৈর্যশীলতার প্রতিদানস্বরূপ তাদের প্রদান করবেন জান্নাত ও রেশমী বস্ত্র।'

এ ঘটনা প্রসঙ্গে আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস বলেন : একদিন ইমাম হাসান ও হুসাইন পীড়িত হয়ে পড়লেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) তাঁর সাহাবীদের নিয়ে তাঁদের দেখতে গেলেন এবং তাঁদের রোগমুক্তির জন্য হযরত আলীকে রোযা মানত করতে বললেন। হযরত আলী ও ফাতিমা রোযার মানত করলেন। তাঁদের রোগমুক্তির পর হযরত ফাতিমা তাঁর পরিজন নিয়ে রোযা রাখা শুরু করলেন। তাঁরা পরপর তিনদিন রোযা রাখার নিয়্যত করেছিলেন। প্রথম দিন হযরত ফাতিমা ইফতারের জন্য পাঁচটি রুটি তৈরি করলেন। যখন তাঁরা ইফতারের জন্য খাবার নিয়ে বসেছেন সে সময়ে একজন মিসকিন এসে খাবার চাইল। তাঁরা তাঁদের খাবারের পুরোটাই সেই মিসকিনকে দিয়ে দিলেন। দ্বিতীয় ও তৃতীয় দিনে একইভাবে ইফতারের সময় যথাক্রমে একজন ইয়াতিম ও একজন বন্দী তাঁদের কাছে খাবার চাইল। তাঁরা পরপর এ তিনদিনই কেবল পানি দিয়ে ইফতার করলেন। এ ঘটনার প্রেক্ষিতেই সূরা দাহ্র বা ইনসান নাযিল হয়।[২০]

২. রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর হাদীসে

রাসূলুল্লাহ (সা.) হযরত ফাতিমার মর্যাদা সম্পর্কে অনেক কথা বলেছেন। যেমন : তিনি বলেন, 'চারজন নারী সমগ্র নারী জাতির মধ্যে সর্বোত্তম : মারইয়াম বিনতে ইমরান, আছিয়া বিনতে মুযাহিম, খাদীজা বিনতে খুওয়াইলিদ এবং ফাতিমা বিনতে মুহাম্মাদ। তাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হচ্ছে ফাতিমা।'[২১]

রাসূল (সা.) বলেন, 'বেহেশতে সর্বপ্রথম আমার নিকট যে পৌঁছবে সে হচ্ছে ফাতিমা বিনতে মুহাম্মাদ।'[২২]

বুখারী শরীফের একটি হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, রাসূল (সা.) বলেন, 'ফাতিমা আমার অস্তিত্বের অংশ। যে তাকে রাগান্বিত করে সে আমাকে রাগান্বিত করে।'[২৩]

তিনি আরও বলেন, 'ফাতিমা কোন ব্যাপারে রাগান্বিত হলে আল্লাহ্ও রাগান্বিত হন এবং ফাতিমার আনন্দে আল্লাহ্ও আনন্দিত হন।'[২৪]

প্রাসঙ্গিকভাবে বলতে হয় যে, এ হাদীসটি আমাদের জন্য অপরিসীম গুরুত্বের অধিকারী। যেহেতু রাসূলুল্লাহ্ (সা.) নিজ প্রবৃত্তি থেকে কোন কথা বলেন না, তাই তাঁর প্রতিটি কথার মধ্যেই গুঢ় তাৎপর্য রয়েছে। তিনি হযরত ফাতিমার মর্যাদা উল্লেখ করার পাশাপাশি তাঁর সন্তুষ্টি-অসন্তুষ্টির প্রতি লক্ষ্য রাখা ও তাঁকে কষ্ট না দেয়ার বিষয়ে সতর্ক করেছেন। হযরত ফাতিমার সন্তুষ্টি-অসন্তুষ্টি ও তাঁকে কষ্ট দেয়ার সাথে মহান আল্লাহ্র ও রাসূলের সন্তুষ্টি-অসন্তুষ্টি এবং রাসূলকে কষ্ট দেয়ার বিষয়কে সম্পৃক্ত করার মাধ্যমে হযরত ফাতিমার আচরণকে ধর্মের সীমায় আনা হয়েছে। রক্তের সম্পর্ক নয়, বরং বেহেশতের নারীদের নেত্রীর অসন্তুষ্টি অবশ্যই আল্লাহকে অসন্তুষ্ট করবে। কারণ, তিনি অন্যায় কোন বিষয়ে অসন্তুষ্ট হতে পারেন না। যদি এ সম্ভাবনা থাকত যে, তিনি মহান আল্লাহ্র সন্তুষ্টির বিপরীত বিষয়ে সন্তুষ্ট হতে পারেন তবে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) কখনই তাঁর সম্পর্কে এমন কথা বলতেন না। আর সেজন্যই হযরত ফাতিমার অসন্তুষ্টি ও তাঁকে কষ্ট দেয়াকে রাসূলের অসন্তুষ্টি ও তাঁকে কষ্ট দেয়ার সমান করা হয়েছে। এমন নয় যে, অন্য দশজন লোককে কষ্ট দেয়ার সাথে এর তুলনা করা হবে। কারণ, রাসূলকে কষ্ট না দেয়ার বিষয়টি কুরআনেই এভাবে বর্ণিত হয়েছে :

إِنَّ ٱلَّذِينَ يُؤْذُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ لَعَنَهُمُ ٱللَّهُ فِى ٱلدُّنْيَا وَٱلْءَاخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُّهِينًا ﴿٥٧﴾

'নিশ্চয়ই যারা আল্লাহ ও রাসূলকে পীড়া দেয়, আল্লাহ তাদের দুনিয়া ও আখেরাতে অভিশপ্ত করেন এবং তিনি তাদের জন্য প্রস্তুত রেখেছেন লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি।'[২৫]

আরেকটি আয়াতে বলা হয়েছে :

وَٱلَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ ٱللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٦١﴾

'...এবং যারা আল্লাহর রাসূলকে যাতনা দেয়, তাদের জন্য রয়েছে বেদনাদায়ক শাস্তি।'[২৬]

হযরত ফাতিমার উপাধি

চারিত্রিক বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের কারণে হযরত ফাতিমা আরও কিছু উপাধিতে ভূষিত হন। এগুলোর মধ্যে সবচেয়ে প্রসিদ্ধ হল যাহরা, যাকিয়াহ, বাতুল ও রাযিয়া।

হযরত ফাতিমার জীবনযাপন প্রণালী

হযরত ফাতিমা খুবই সাধারণ জীবন যাপন করতেন। সংসারের যাবতীয় কাজ তিনি নিজের হাতে করতেন। তাঁর কাজে সাহায্যের জন্য কোন দাস-দাসী ছিল না। মশক দিয়ে পানি উত্তোলনের ফলে তাঁর শরীরে দাগ পড়ে গিয়েছিল। তিনি যাঁতার মাধ্যমে এত পরিমাণ আটা তৈরি করতেন যে, তাঁর হাতে ফোস্কা পড়ে যেত। আর তিনি সেই আটা দিয়ে রুটি তৈরি করে মদীনার দরিদ্র ব্যক্তিদের মধ্যে বিতরণ করতেন। হযরত ফাতিমা কাপড়ে তালি লাগিয়ে সেই কাপড় পরিধান করতেন। পার্থিব কোন বস্তুই তাঁকে আকৃষ্ট করতে পারত না। আর এজন্যই রাসূল (সা.) তাঁকে 'বাতুল' উপাধিতে ভূষিত করেছিলেন।

হযরত ফাতিমার ইবাদাত-বন্দেগী

যখন রাত্রিতে চারিদিকে নিস্তব্ধতা নেমে আসত, সকলেই ঘুমের কোলে ঢলে পড়ত তখন হযরত ফাতিমা নিবিষ্টচিত্তে আল্লাহ্‌র ইবাদাত-বন্দেগীতে লিপ্ত হতেন। তিনি সারারাত জেগে নামায পড়তেন, মহান আল্লাহ্‌র যিকির করতেন এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর উম্মতের জন্য দো'আ করতেন। তিনি এত বেশি নামায পড়তেন যে, তাঁর পা ফুলে যেত।

ইমাম হাসান (আ.) বলেন, 'আমার আম্মা বছরের অধিকাংশ দিন নফল রোযা রাখতেন আর রাত্রির অধিকাংশ সময়ই তিনি আল্লাহ্‌র ইবাদাতে কাটিয়ে দিতেন। তিনি মহান আল্লাহ্‌র দরবারে দু'হাত তুলে দো'আ করে এমনভাবে কান্নাকাটি করতেন যে, চোখের পানিতে বুক ভিজে যেত।' সংসারের কাজ করার সময়ও তাঁর মুখে আল্লাহ্‌র যিকির থাকত।

রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর ওফাতের পর

ইতিহাসে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর ওফাতের পর কিছু বিষয় নিয়ে হযরত ফাতিমা অসন্তুষ্ট ছিলেন, তাঁকে কষ্ট দেয়া হয়েছিল এবং তিনি এসব বিষয় প্রকাশ্যে ব্যক্তও করেছিলেন।

রাসূলুল্লাহ (সা.) তথা ইসলামের বিরুদ্ধে যে ষড়যন্ত্র শুরু হয়েছিল রাসূলের জীবদ্দশায় তাঁর জীবনের শেষ দিনগুলোতে সেই ষড়যন্ত্রের বাস্তবায়ন হয়েছে রাসূলের পবিত্র দেহ দাফন করার আগেই। একদিকে পিতার বিরহে হৃদয় দুঃখভারাক্রান্ত, অন্যদিকে মুনাফিকদের চক্রান্ত দারুণভাবে মর্মাহত করে নবীকন্যা হযরত ফাতিমাকে। তিনি দিনরাত রাসূলের কবরে গিয়ে ক্রন্দন করতেন। তিনি বলতেন, 'হে পিতা! আপনার ওফাতের পর আমার ওপর এত জুলুম, দুঃখ-দুর্দশা নেমে এসেছে যে, তা যদি আলোকিত দিনের ওপর আপতিত হত তবে তা অন্ধকারাচ্ছন্ন রাতে পরিণত হত।'

রাসূলের সম্মানিতা স্ত্রী হযরত উম্মে সালামাহ্ বলেন : রাসূলের ওফাতের পর ফাতিমাকে দেখতে যাই এবং তাঁর অবস্থা জানতে চাই। তিনি জবাব দিলেন : অত্যন্ত দুঃখ-কষ্টে দিন অতিবাহিত হচ্ছে।...'[২৭]

হযরত ফাতিমার ইন্তেকাল

এ রকম কষ্টের মধ্য দিয়েই রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর ওফাতের অল্প কিছুদিন পরই হযরত ফাতিমা এ পৃথিবী থেকে বিদায় গ্রহণ করেন। কিন্তু এ প্রশ্ন খুব স্বাভাবিকভাবেই এসে যায় যে, হযরত ফাতিমার বয়স তখন খুব বেশি ছিল না, আবার তিনি কোনরকম অসুস্থতায়ও ভুগছিলেন না, তবে কীভাবে তিনি মৃত্যুবরণ করলেন?

রাসূল (সা.) ওফাতের আগে হযরত ফাতিমার কানে কানে বলে গিয়েছিলেন যে, তিনিই তাঁর সাথে প্রথম মিলিত হবেন। নিশ্চয়ই মহান আল্লাহ তাঁর প্রিয় রাসূলকে এও জানিয়েছিলেন যে, কীভাবে হযরত ফাতিমা তাঁর সাথে এত তাড়াতাড়ি মিলিত হবেন। আর সেজন্যই কি রাসূল (সা.) বারবার তাঁর উম্মতকে সতর্ক করছেন যে, তারা যেন হযরত ফাতিমাকে কষ্ট না দেয়, তাঁকে অসন্তুষ্ট না করে।

কোন কোন ইতিাসবেত্তা এ বিষয়টিই তাঁদের গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর ওফাতের পর খলীফা নির্বাচন নিয়ে মতপার্থক্যের সৃষ্টি হয়। এরই এক পর্যায়ে হযরত ফাতিমার গৃহে আক্রমণ করা হয়।[২৮] হযরত ফাতিমা আহত হন এবং পরবর্তীকালে এ আঘাতজনিত কারণেই শাহাদাতবরণ করেন।[২৯]

তথ্যসূত্র

১. সূরা নাজ্ম : ৩-৪

২. সূরা তাওবা : ৩৩। এ আয়াতটি কুরআন মাজীদে কয়েকটি স্থানে বিদ্যমান। ফুসুলুল মুহিম্মা গ্রন্থে এ আয়াতের তাফসীরে সাঈদ ইবনে যুবাইর হতে বর্ণিত হয়েছে যে, এর লক্ষ্য হযরত ইমাম মাহদী (আ.) যিনি হযরত ফাতিমা (আ.)-এর সন্তানগণের মধ্যে থেকে হবেন। ফখরুদ্দীন রাযী তাফসীরে কাবীর গ্রন্থে ও আল্লামা সুয়ূতী তাফসীরে দুররে মানসূর গ্রন্থে এবং সাঈদ ইবনে মানসুর ও বায়হাকী নিজ নিজ সুনানে হযরত জাবির এবং আবু হুরায়রা হতে বর্ণনা করেছেন যে, এটা তখনই হবে যখন ইসলাম ভিন্ন না ইয়াহুদী থাকবে, না খ্রিস্টান, আর না অন্য কোন ধর্মের অনুসারী।

৩. কানজুল উম্মাল, ৬ষ্ঠ খণ্ড, হাদীস ২৫১০, পৃ. ১৫২

৪. মানাকিবে শাহরাশুব, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১১৩

৫. সূরা নাহল : ৫৮-৫৯

৬. মহানবী (সা.) ও তাঁর আহলে বাইত, পৃ. ৫১

৭. তারীখে বাগদাদ, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৩১

৮. উসদুল গাবাহ, ৫ম খণ্ড, পৃ. ৫২০

৯. তাযকেরাতুল খাওয়াস, পৃ. ৩০৬

১০. যাখায়েরুল উকবা, পৃ. ৩১

১১. তাযকেরাতুল খাওয়াস, পৃ. ৩০৬

১২. ভাষণ দু'টি আঞ্জুমান-এ-পাঞ্জাতনী, খুলনা কর্তৃক প্রকাশিত আয়াতুল্লাহ্ আল উযমা মাকারেম শিরাজী প্রণীত নারীকুল শিরোমণি গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে।

১৩. কাশফুল গুম্মাহ, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৩

১৪. বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার কর্তৃক প্রকাশিত জামে আত-তিরমিযী, ৬ষ্ঠ খণ্ড, হাদীস নং ৩৭২০

১৫. প্রাগুক্ত, হাদীস নং ৩৭২৪

১৬. প্রাগুক্ত, হাদীস নং ৩৭২৬

১৭. প্রাগুক্ত, হাদীস নং ৩৭২৫

১৮. বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার কর্তৃক প্রকাশিত সহীহ মুসলিম, ৭ম খণ্ড, হাদীস নং ৬০৮০

১৯. তাফসীরে জালালাইন, ১ম খণ্ড, পৃ.৬০; বায়যাভী, ১ম খণ্ড, পৃ. ১১৮, তাফসীরে দুররুল মানসুর, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৯, মিশর মুদ্রণ

২০. তাফসীরে জামাখশারী, ২য় খণ্ড, পৃ. ৫২; তাফসীরে ফখরে রাযী, ৮ম খণ্ড, পৃ. ২৭৬; তাফসীরে দুররে মানসূর, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ২৯৯; যাখায়েরুল উকবা, পৃ. ৮৯;

২১. যাখায়েরুল উকবা, পৃ. ৪৪

২২. মিজানুল ইতিদাল, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৩১; কানজুল উম্মাল, ২য় খণ্ড, পৃ. ২১৯

২৩. বুখারী, কিতাবুল বাদাউল খাল্‌ক

২৪. কাশফুল গুম্মাহ, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৪; মানাকিবে শাহরাশুব, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১০৬; উয়ূন আখবারির রিযা (আ.), ২য় খণ্ড, পৃ. ২৬

২৫. সূরা আহযাব : ৫৭

২৬. সূরা তাওবা : ৬১

২৭. হযরত আয়াতুল্লাহ্ আল উযমা মাকারেম সিরাজী প্রণীত নারীকুলের শিরোমণি হযরত ফাতিমা যাহরা (আ.), পৃ. ৪১

২৮. আল মিলাল ওয়ান নিহাল, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫৭; ইকদুল ফারীদ, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৯৪, মিসর মুদ্রণ, তারীখে তাবারী, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৪৩, বৈরুত মুদ্রণ ।

২৯. মুহাদ্দিসে কুম্মী প্রণীত বাইতুল আহযান

ইসলাম ও ধর্মসমূহের মধ্যে সংলাপ

সাইয়্যেদ আবুল ফাযল মুসাভীয়ান

সার সংক্ষেপ

স্মরণাতীতকাল থেকে বিভিন্ন ঐশী ধর্মের অনুসারীদের মধ্যে ধর্মীয় সংলাপের বিষয়টি তাদের মনোযোগের কেন্দ্রবিন্দুতে অবস্থান করছে। এ ধরনের সংলাপের মূল উদ্দেশ্যেই হল বিভিন্ন বিশ্বাসের শিক্ষার সাথে সাদৃশ্য খুঁজে বের করা। আর এক্ষেত্রে বক্ষমাণ নিবন্ধে লেখক ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরেছেন।

প্রথমে আন্তঃধর্মীয় সংলাপের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস পাঠকদের সামনে তুলে ধরা হয়েছে এবং ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে এ ধরনের সংলাপের গুরুত্ব আলোচনা করা হয়েছে এবং এর ধারাবাহিকতায় এ ধরনের সংলাপের গুরুত্ব ও কার্যকারিতার ক্ষেত্রে কুরআনের সংক্ষিপ্ত যুক্তিসমূহ উপস্থাপিত হয়েছে। পরিশেষে একটি সুন্দর ও ফলপ্রসূ আন্তঃধর্মীয় সংলাপ সম্পাদনে লেখক কর্তৃক চারটি পূর্বশর্ত উপস্থাপিত হয়েছে।

ভূমিকা

বিপরীতধর্মী চিন্তা-ভাবনাসমূহের মধ্যকার সংলাপের বিষয়টি পৃথিবীতে মানব জীবনের ইতিহাসের মতোই প্রাচীন[১]। প্রচীনকাল থেকেই অন্য ধর্মের ওপর নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণে বিভিন্ন ধর্মের অনুসারীদের মধ্যে বিতর্কে লিপ্ত হওয়াও একটি সাধারণ বিষয় ছিল।

পারস্পরিক সাদৃশ্য ও অভিন্ন মূল্যবোধসমূহ খুঁজে বের করতে বিভিন্ন ধর্মের অনুসারীদের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ পরিবেশে সংলাপ আয়োজন একটি নতুন ঘটনা যে

বিষয়ে এ সকল ধর্মের অনুসারীরা সাম্প্রতিক দশকগুলোতে যথেষ্ট আগ্রহ দেখিয়েছে[২]। তবে এক্ষেত্রে একেবারে নিখুঁতভাবে এ ধরনের সংলাপ আয়োজনের মূল উৎস আমরা খুঁজে পাই না।

ইয়াহুদী ও খ্রিস্টধর্মের মতো একত্ববাদী ধর্মসমূহের ইতিহাসের পর্যালোচনা এ সত্যকেই প্রতিভাত করে যে, তাদের স্ব-স্ব অভিভাবকগণ বাকী আর সকল ধর্মের নির্ভরযোগ্যতা অস্বীকারপূর্বক শুধু নিজেদের ধর্মকেই স্রষ্টার কাছ থেকে প্রকৃত প্রত্যাদেশ বলে বিবেচনা করে[৩]।

পবিত্র কুরআন ইয়াহুদী ও খ্রিস্টানদের এ মানসিকতাকে যথাযথভাবেই বর্ণনা করেছে:

'ইয়াহুদীরা বলে খ্রিস্টানদের কোন ভিত্তি নেই; এবং খ্রিস্টানরা বলে ইয়াহুদীদের কোন ভিত্তি নেই।'[৪]

বৈশ্বিক ধর্ম হিসাবে ইসলামের আবির্ভাব এবং ইতিহাসের প্রথম বছরগুলোতে বিস্তীর্ণ অঞ্চলে এর দ্রুত বিস্তারলাভ এ ধরনের ভ্রান্ত মানসিকতার মোড় ঘুরিয়ে দেয় এবং একত্ববাদীদের মধ্যে অর্থপূর্ণ সংলাপ সংঘটনের সূচনা ঘটায়।

অন্যান্য বিশ্বাসের সাথে অভিন্ন দিকগুলো তুলে ধরার উদ্দেশ্যে তাদের অনুসারীদের সাথে দৃষ্টিভঙ্গি বিনিময়ের পথ ইসলাম সুস্পষ্টভাবেই উন্মুক্ত করে। এই শেষ সত্যধর্ম যে কোন বিষয়ে বলপূর্বক বিশ্বাসকে বাতিল করে এবং একত্ববাদের প্রতি বিশ্বাসকে উন্নীত করতে মুক্ত আলোচনাকে উৎসাহিত করে।

ইসলাম যৌক্তিক আলোচনার ওপর গুরুত্ব আরোপ করে, যা পূর্বের ঐশী ধর্মের শিক্ষার অন্তর্ভুক্ত ছিল না। এ ধরনের কোন ধর্মোপদেশ না তাদের পবিত্র গ্রন্থে, আর না তাদের ধর্মীয় অভিভাবকদের আচার-আচরণে খুঁজে পাওয়া যায়[৫]।

পবিত্র কুরআন এবং সংলাপ

পবিত্র কুরআনের বহু সংখ্যক আয়াতে প্রতিপক্ষ ও সমর্থকদের সাথে সংলাপকে উৎসাহিত করা হয়েছে। এ ধরনের সংলাপের উদাহরণ পবিত্র এ গ্রন্থের বিভিন্ন অধ্যায়ে উপস্থাপিত হয়েছে। মহিমান্বিত আল্লাহ নিজেই প্রথম সংলাপে ব্যাপৃত হয়েছেন। মানুষের সৃষ্টি কতটা উপযোগী হবে সে বিষয়ে তিনি ফেরেশতাদের সাথে

আলোচনা করেছেন এবং এক্ষেত্রে তাদের যুক্তি শ্রবণ করেছেন। অতঃপর তিনি মানব সৃষ্টির ব্যাপারে তাঁর সিদ্ধান্তের উপযুক্ততা প্রমাণের জন্য আদম (আ.)-কে ফেরেশতাদের সম্মুখে উপস্থিত করেন যাতে তিনি (আদম) তাঁর নিজস্ব কিছু যোগ্যতাকে তুলে ধরতে পারেন। এভাবে স্রষ্টা মানব সৃষ্টির ব্যাপারে ফেরেশতাদের নেতিবাচক পূর্বানুমান যে ভুল ছিল সে ব্যাপারে তাঁদের ভেতর প্রত্যয়ের সৃষ্টি করেন[৬]। তিনি শয়তানের সাথেও কথোপকথনে লিপ্ত হয়েছেন যে তাঁর প্রতি অবাধ্যতা ও বিদ্রোহ প্রদর্শন করেছে এবং তাকে (শয়তান) শেষ বিচারদিন পর্যন্ত অবকাশ দিয়েছেন[৭]।

নবী-রাসূলগণও তাঁদের আত্মীয়স্বজন ও প্রতিপক্ষের সাথে সংলাপ করেছেন।

হযরত নূহ (আ.) অন্য যে কোন নবীর চেয়ে অধিক সংলাপে লিপ্ত হয়েছেন। তাঁর জাতি তাঁকে বলেছিল :

'...হে নূহ! তুমি অবশ্যই আমাদের সাথে বিবাদ করেছ এবং অতিমাত্রায় বিবাদ করেছ...।'[৮]

নূহ (আ.) স্রষ্টার সাথে তাঁর বিচ্যুত পুত্রের ব্যাপারেও কথোপকথন করেছেন।[৯]

একইভাবে ইবরাহীম (আ.) তাঁর জাতির সাথে একত্ববাদের মৌলিক বিষয়ে যৌক্তিক উপায়ে আলোচনাই শুধু করেননি এমনকি লূত (আ.)-এর গোত্রকে যাতে কঠিন আযাব দেয়া না হয় সে উদ্দেশ্যে আল্লাহ তা'আলার সাথে বাক্যালাপ করেন।[১০]

অন্য নবিগণও, যেমন হযরত সালেহ (আ.), লূত (আ.), মূসা (আ.), ঈসা (আ.) তাঁদের নিজ নিজ জাতিকে সঠিক পথ প্রদর্শনের লক্ষ্যে তাদের সাথে আলাপ-আলোচনা ও বিতর্ক করেছেন। এসব কথোপকথনের কিছু কিছু অংশ পবিত্র কুরআনে লিপিবদ্ধ রয়েছে।

নবী মুহাম্মাদ (সা.) এবং নিষ্পাপ ইমামগণও একত্ববাদের বিরোধী পক্ষ এবং যেসব বিশ্বাসী কোনভাবে সত্যপথ থেকে বিচ্যুত হয়েছে, তাদের সাথে যুক্তিতর্কে লিপ্ত হতেন। এসব যুক্তিতর্কের কিছু অংশ প্রখ্যাত আলেম আবু মনসুর আহমদ ইবনে আলী ইবন আবি তালিব তাবারসির একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ 'আল ইহতিজাজ' গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।

এ মূল্যবান গ্রন্থের ভূমিকায় তাবারসি (র.) বিতর্কের বিভিন্ন ধরন ও তা অনুষ্ঠানের ব্যাপারে ইসলামী নিয়মনীতির বিষয়ে যুক্তি উপস্থাপন করেছেন। অতঃপর তিনি, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) অবিশ্বাসীদের সাথে যে 'জিদালুল আহসান' বা বিতর্কের সর্বোত্তম পন্থা অবলম্বন করতেন, তার উদাহরণ উপস্থাপন করেছেন। এ পদ্ধতিতে বিতর্কে অবতীর্ণ হওয়াকে পবিত্র কুরআনে নবীর পদ্ধতি হিসাবে উল্লেখ করেছে।

তাবারসি এরপর বিভিন্ন অধ্যায়ে নবী (সা.)-এর আহলে বাইতের প্রত্যেক সদস্য কর্তৃক বর্ণিত হাদীস থেকে রাসূল (সা.) যে বিভিন্ন ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর সাথে বিতর্ক করেছেন তা লিপিবদ্ধ করেছেন।

পবিত্র কুরআন নবী (সা.) ও বিশ্বাসীদের জন্য সংলাপে অবতীর্ণ হওয়াকে 'দায়িত্ব' বিবেচনা করে উৎসাহিত করে :

'মানুষকে প্রজ্ঞা ও সদুপদেশ দ্বারা তোমার রবের পথে আহ্বান কর এবং তাদের সাথে বিতর্ক কর সর্বোত্তম উপায়ে।'[১১]

পবিত্র এ আয়াতটি এ কথাই পুনরায় উচ্চারণ করে যে, মানুষকে প্রজ্ঞাপূর্ণ উপায় এবং কার্যকর সংলাপের জন্য সর্বোত্তম পদ্ধতি অবলম্বনের মাধ্যমে আল্লাহ্র পথে আহ্বান করা মহানবী (সা.)-এর দায়িত্ব।[১২]

অন্য একটি আয়াতে পবিত্র কুরআন বিশেষ করে আহলে কিতাবের সাথে এ ধরনের আলাপ-আলোচনার পরামর্শ দিয়েছে : 'তোমরা গ্রন্থধারীদের সাথে তর্ক-বিতর্ক করবে কেবল উত্তম পন্থায়...'[১৩]

এ পবিত্র আয়তটি সকল বিশ্বাসীকে শামিল করে।

সূরা আলে ইমরানের ৬৪ নম্বর আয়াত পবিত্র কুরআন নবী (সা.)-কে আনুষ্ঠানিকভাবে আহলে কিতাবের সাথে আলোচনায় বসার ব্যাপারে দায়িত্ব প্রদান করেছে, সেখানে আলোচনার বিষয়বস্তুও পরিষ্কার করে দেয়া হয়েছে :

'বল : হে আহলে কিতাবগণ! একটি বিষয়ের দিকে আস যা আমাদের ও তোমাদের মধ্যে একই যে, আমরা আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারও ইবাদাত করব না, তাঁর সাথে কোন শরীক করব না এবং একমাত্র আল্লাহ্ ছাড়া কাউকে পালনকর্তা সাব্যস্ত করব না।

তারপর যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তাহলে বলে দাও যে, সাক্ষী থাক, আমরা তো অনুগত।'

এ পবিত্র আয়াতে যে বিষয়গুলোর ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে সেগুলো হল :

১. আহলে কিতাবের অনুসারীদের সাথে আলোচনার মাধ্যমে একটি অভিন্ন বিষয়ে উপনীত হওয়া। এ ক্ষেত্রে আলোচনার মূল অক্ষটি হবে একত্ববাদ যা ছিল সকল সত্য নবিগণের শিক্ষার মূল বিষয়বস্তু।[১৪]

২. মুসলমানদের পরামর্শ দেয়া হয়েছে যে, আলোচনা যেন আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব প্রমাণের প্রচেষ্টার মাধ্যমে শুরু না হয়; বরং তা যেন শুরু হয় আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য সব কিছুর ইবাদাতের অস্বীকৃতির মাধ্যমে।

পবিত্র কুরআনে স্রষ্টার সাথে অংশী স্থাপনের অস্বীকৃতি, স্রষ্টার অস্তিত্ব প্রমাণের পূর্বে স্থান পেয়েছে। আর তা এজন্য যে, পবিত্র কুরআন অনুযায়ী একত্ববাদের নির্যাস মানুষের সহজাত প্রকৃতিরই একটি অংশ। এ ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম শুধু ঐ সব পর্যায়েই দেখতে পাওয়া যায় যারা সত্যের সাথে শত্রুতার কারণে অথবা নিরেট অজ্ঞতাবশত তাদের আত্মার ভেতরের সেই ঐশী আলোকে নিভিয়ে ফেলেছে।

সুতরাং কোন সুস্থ মস্তিষ্কসম্পন্ন ব্যক্তি স্রষ্টার অস্তিত্ব নিয়ে কখনও সন্দেহ পোষণ করে না। এমনকি পৌত্তলিকদের ব্যাপারে আলোচনার ক্ষেত্রে পবিত্র কুরআন তাদের পরোক্ষভাবে একত্ববাদী হিসাবেই বিবেচনা করে যারা তাদের মূর্তিগুলোর উপাসনার মাধ্যমে স্রষ্টার কাছে পৌঁছতে চায় :

'যদি তুমি তাদের জিজ্ঞাসা কর, কে তাদের সৃষ্টি করেছে, তবে অবশ্যই তারা বলবে : 'আল্লাহ্।' অতঃপর তারা কোথায় ফিরে যাচ্ছে?'[১৫]

কিন্তু কুরআন অতঃপর এ বিষয়টি স্পষ্ট করে দেয় যে, একত্ববাদের এ ধরনের পাঠ অবশেষে বহুত্ববাদের ভ্রান্তিতে পর্যবসিত হয় :

'... আমরা এদের উপাসনা এজন্যই করি যে, এরা আমাদের আল্লাহ্‌র সান্নিধ্য এনে দেবে।'[১৬]

যারা স্রষ্টার সাথে অংশী স্থাপন করে তাদের সমস্যাটি সবসময় এই যে, স্রষ্টা যে অংশীর প্রয়োজনমুক্ত তা তারা অনুধাবনে অক্ষম।

মানব জাতি এমন এক অজ্ঞতার দ্বারা পীড়িত হলেও তারা তাদের এ অজ্ঞতার উৎস উপলব্ধি করতে পারেনি। পবিত্র কুরআনে এ ধরনের বৈশিষ্ট্যকে এভাবে বর্ণনা করা হয়েছে : 'তাদের অধিকাংশ বিশ্বাস করে, কিন্তু অংশী স্থাপন করে।'[১৭]

৩. আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কারও উপাসনা না করার ক্ষেত্রে দু'টি মুখ্য বিষয় রয়েছে :

ক. তাঁর সাথে কোন অংশী স্থাপন না করা :

'... তাঁর সাথে আমরা কোন অংশী স্থাপন করব না।' যেমনটি কিছু সংখ্যক খ্রিস্টান ত্রিত্ববাদের প্রচার করে অথবা কোন কোন নবীর অনুসারীরা তাদের নবীকে 'খোদার পুত্র' হিসাবে দাবি করে থাকে। যেহেতু মহান আল্লাহ্ অস্তিত্বসমূহের উৎস এবং তাঁর অত্যুজ্জ্বল ঐশী আলোকে মুগ্ধ হয়ে মানুষ তাঁর পবিত্র সাম্রাজ্যে আশ্রয় গ্রহণ করে। তাই মানব জাতির উচিত একমাত্র তাঁরই উপাসনা করা যিনি এক এবং যাঁর কোন অংশী নেই।

খ. পবিত্র আয়াতাংশ '... যে, আমরা আল্লাহ্ ছাড়া কাউকে পালনকর্তা সাব্যস্ত করব না...' – আহলে কিতাবদের মধ্যে বিদ্যমান একটি রীতির প্রতি ইঙ্গিত করে যা সূরা তাওবার ৩১ নং আয়াতে সুস্পষ্ট করা হয়েছে : 'তারা আল্লাহ্ ব্যতীত তাদের পণ্ডিতগণকে এবং সংসারবিরাগিগণকে তাদের রব রূপে গ্রহণ করেছে।'

সমাজের বিভিন্ন সদস্যের অপরাপর সদস্যের তুলনায় যতই শ্রেষ্ঠত্ব থাক না কেন তাদের সকলের মাঝেই একই মানবপ্রকৃতি বিদ্যমান। আর তাই এ কারণে নিজের স্বার্থপর ইচ্ছা পূরণে বাধ্য করা কারও জন্যই সঠিক নয়।

সৃষ্টিগত দিক থেকে একই হওয়া সত্ত্বেও যদি কোন ব্যক্তির প্রতি এমনভাবে নতি স্বীকার করা হয় যা তাকে বিশেষ ক্ষমতা ভোগের অধিকার প্রদান করে, তবে তা ক্রমেই তার প্রভাবাধীন ব্যক্তিবর্গের সাথে তাকে অতুলনীয় করে তোলে যা হয়ত তাকে মিথ্যা ঐশী শক্তির দাবীদারে পরিণত করতে প্ররোচিত করে। পরিণামে সে ব্যক্তি হয়ত সে সকল বিষয়ই করতে চাইবে যা তার ভাল লাগে, আর যা সে অপছন্দ করে সে চাইবে সেগুলোকে বাতিল করতে। আর এটিই তাকে এক উদ্ধত স্বৈরাচারিতে পরিণত করে। খুব স্বাভাবিকভাবেই তা মানবীয় প্রকৃতিবিরুদ্ধ এবং সমাজে সকল কলুষের মূল কারণ।

৪. যেমনটি আপনারা ইতোমধ্যে লক্ষ্য করেছেন যে, আমাদের আলোচনা মানুষের সহজাত প্রকৃতি ঘিরেই আবর্তিত হচ্ছে, একত্ববাদী ধর্মসমূহের মৌলিক বিষয়াবলীও এই একই ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত।

৫. '...তারপর যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তাহলে বলে দাও যে, সাক্ষী থাক, আমরা তো (অন্তত) অনুগত'– পবিত্র এ আয়াতাংশে আহলে কিতাবীদের সাথে আলোচনা ফলপ্রসূ না হলে কীভাবে তা শেষ করতে হবে সেটা আল্লাহ্ পরিষ্কার করেছেন।

যদি তারা ঐশী সত্য গ্রহণে বিরত থাকে, তাদের সহজাত প্রকৃতির আহ্বানকে প্রত্যাখ্যান করে এবং কোন যথার্থ কারণ ছাড়াই আল্লাহ্র নবিগণের দাওয়াতকে উপেক্ষা করে তাহলে এটা বলে দেয়াই যথেষ্ট যে, 'আমরা তা গ্রহণ করেছি এবং এ সকল বিধানের প্রতি আমরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ এবং তোমরা এ সকল ব্যাপারেই সাক্ষী থাক।' (এরপর মুসলমানদের উচিত মূর্তিপূজকদের সাথে আলোচনায় রত হওয়া– কোন ধরনের বিবাদে না জড়িয়ে এবং অন্যের ওপর নিজের ধারণাকে চাপিয়ে না দিয়ে।)

সুতরাং যা-ই হোক না কেন, পবিত্র কুরআন অনুযায়ী ইসলামই একমাত্র পরিপূর্ণ ধর্ম হওয়া সত্ত্বেও মুসলমানদেরকে আহলে কিতাবদের সাথে শান্তিপূর্ণভাবে পাশাপাশি বাস করতে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে।

সংলাপের উপকারিতাসমূহ

১. শত্রুতার পরিসমাপ্তি

মানুষে মানুষে পার্থক্য[১৮] ও শত্রুতার উৎস হচ্ছে কোন কোন গোষ্ঠীর নিয়ন্ত্রণমূলক প্রবণতাজাত অপরকে শোষণ করার আকাঙ্ক্ষা, যেক্ষেত্রে শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে তা প্রতিহত করা এবং 'জিহাদ' (যা প্রকৃত অর্থে প্রতিরক্ষার স্বার্থে করা হয়) বলবৎ করা ব্যতীত আর কোন উপায় থাকে না।

এ সকল বিভেদ আদর্শগত বা সামাজিক সমস্যা ইত্যাদি থেকে উদ্ভূত হতে পারে যার গোড়া রয়ে গেছে ব্যক্তিবর্গের মানসিকতা ও দৃষ্টিভঙ্গির গভীরে। যে কোন মানসিকতা যা নিজেকে সত্য ও সঠিক বলে বিবেচনা করে তাকে আলোচনার ক্ষেত্রে সহিংস

কর্কশ আচরণ ও অসহিষ্ণুতার বিপরীতে অবশ্যই যুক্তি ও বিচার-বিবেচনার আশ্রয় গ্রহণ করতে হবে। আর তা এ কারণে যে, বিশ্বাস হচ্ছে হৃদয়ঙ্গম করার বিষয় এবং কাউকেই কোন আদর্শে বিশ্বাস স্থাপনে বাধ্য করা যাবে না। অভিজ্ঞতা থেকে এটি প্রমাণিত যে, এমনকি যখন কোন সঠিক অবস্থানও শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে এগিয়ে নেয়ার চেষ্টা করা হয়, দীর্ঘ মেয়াদে তা কোন সাফল্য বয়ে আনে না; বরং এর বিপরীতে কঠিন বাধার সৃষ্টি হয়।

বিপরীতক্রমে যৌক্তিক পন্থা শত্রুতাকে বন্ধুত্বে রূপান্তরের নিশ্চয়তা দান করে। এক্ষেত্রে নবী (সা.)-এর প্রতি পবিত্র কুরআনের একটি উপদেশ রয়েছে : 'কল্যাণ ও অকল্যাণ কখনও সমান হতে পারে না; সুতরাং তুমি মন্দের জবাব সৌজন্যমূলকভাবে দান কর। ফলে যারা তোমার সঙ্গে শত্রুতা করে তারা তোমার অন্তরঙ্গ বন্ধুর মতো হয়ে যাবে।'[১৯]

পবিত্র এ আয়াতটিতে 'আহ্সান' শব্দের ব্যবহার মুসলমানদের এ আহ্বান জানায় যে, তারা যেন হাসিমুখে এবং সুন্দর শব্দ সহযোগে তাদের প্রতিপক্ষের সাথে আলোচনায় লিপ্ত হয়। অসৌজন্যমূলক এবং প্ররোচনাদানকারী বাক্যালাপ শত্রুতার জন্ম দেয় এবং ঘৃণা-বিদ্বেষ বৃদ্ধি করে, আর এ কারণে তা পরিহার করা উচিত। এ ধরনের নীতি অনুসরণের মাধ্যমে অপর পক্ষের কাছে আমরা আমাদের বন্ধুত্বপূর্ণ মনোভাব প্রকাশ করতে পারি এবং আমাদের যে কোন অসৎ উদ্দেশ্য নেই তা প্রমাণ করতে পারি। এ ধরনের মনোভাব নিশ্চিতভাবেই যে কারও প্রতিপক্ষের ওপর ইতিবাচক প্রভাব ফেলতে বাধ্য।

ইসলাম সেই শত্রুতার পরিসমাপ্তি ঘটাতে চায় যা ইতিহাস জুড়ে মিথ্যা বিশ্বাস পোষণের অভিযোগে বহু মানুষের প্রাণহানির কারণ ঘটিয়েছে।

২. সকলের মুক্তির ভিত্তিভূমি রচনা

যে কোন সুস্থ মস্তিষ্কসম্পন্ন ব্যক্তিই সত্যে উপনীত হতে এবং বিচ্যুত বিশ্বাস থেকে বেঁচে থাকার প্রত্যাশী। এ উদ্দেশ্য পূরণের কিছু পূর্বশর্ত রয়েছে। যার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণটি হচ্ছে সত্য-সন্ধানী মনোভাব।

মানুষের পক্ষে কেবল তখনি সত্যে উপনীত হওয়া সম্ভব হবে যখন সে বিভিন্ন মতবাদকে পক্ষপাতহীনভাবে পর্যালোচনা করতে পারবে এবং এ সকল মতবাদের পিছনে যে সব যুক্তি রয়েছে তা পূর্ণ নিরপেক্ষতার সাথে বিবেচনা করে সর্বোত্তমটিকে বাছাই করতে সক্ষম হবে।

এ বিষয়ে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই যে, আমরা যদি কোন মতবাদকে কোন পূর্বধারণার বশবর্তী হয়ে বিচার করি তাহলে আমরা কখনই তার প্রকৃত রূপ উপলব্ধি করতে সক্ষম হব না। আর তাই আমাদের পক্ষে সত্যে উপনীত হওয়ার সে উদ্দেশ্য পূরণও সম্ভব হবে না। এ বিষয়ে পবিত্র কুরআন বলছে : 'অতএব, সুসংবাদ দাও আমার দাসদের যারা মনোযোগ সহকারে কথা শোনে এবং যা উত্তম তা গ্রহণ করে। তাদের আল্লাহ্ সৎপথে পরিচালিত করেন এবং তারাই বোধশক্তিসম্পন্ন।'[২০]

ইমাম মূসা ইবনে জাফর (আ.)-এর নিকট থেকে বর্ণিত হয়েছে, 'যারা গভীরভাবে চিন্তাভাবনা করে তাদের জন্য আল্লাহ্ সুসংবাদ প্রেরণ করেছেন এবং সে সুসংবাদ সকল ধার্মিক ব্যক্তির ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হবে না।'[২১] মরহুম আল্লামা মোহাম্মাদ হোসেইন তাবাতাবাঈ কুরআনের এ আয়াতে দু'টি বক্তব্য আছে বলে বিশ্বাস করতেন। একটি হচ্ছে আল্লাহ্ তা'আলার সাধারণ পথনির্দেশ এবং অপরটি তাঁর উচ্চতর পথনির্দেশ। আল্লামা তাবাতাবাঈর ব্যাখ্যা অনুসারে প্রথমটি হচ্ছে আল্লাহ্ তা'আলার ইচ্ছা যা দ্বারা মানুষের ভেতর সত্য গ্রহণের আকাঙ্ক্ষা তৈরি হয় এবং পরবর্তীটি অর্থাৎ উচ্চতর পথনির্দেশ হচ্ছে সকল ঐশী শিক্ষা উপলব্ধি করার সক্ষমতা।[২২]

উত্তম সংলাপের পূর্বশর্ত

উত্তম সংলাপ আয়োজনের ক্ষেত্রে যিনি এর মূল দায়িত্বে নিয়োজিত থাকবেন তাঁকে অবশ্যই কিছু নীতিমালা পূর্বশর্ত হিসেবে গ্রহণ করতে হবে। এ সকল নীতিমালা নিম্নরূপ হতে পারে :

ক. জ্ঞান ও সচেতনতার প্রতি শ্রদ্ধা পোষণ

দার্শনিকদের অভিমত অনুযায়ী অন্যান্য সৃষ্টি থেকে মানুষের পার্থক্যকারী বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তার কথা বলার ক্ষমতা। 'কথা বলার ক্ষমতা' দ্বারা তাঁরা যা বোঝাতে চান তা

হচ্ছে কোন জটিল বিষয়ে মানুষের চিন্তাভাবনা করার ক্ষমতা যা জিহ্বার মাধ্যমে প্রকাশিত হয় ।

কিন্তু এমন অনেক ব্যক্তি রয়েছেন যাঁরা যুক্তি-বুদ্ধি ও গভীরভাবে চিন্তাভাবনার ক্ষেত্রে মোটেও মনোযোগী নন এবং সাধারণভাবে চিন্তা করতেও আগ্রহী নন । পবিত্র কুরআন তাদেরকে 'সবচেয়ে নিকৃষ্ট জীব' বলে অভিহিত করেছে যারা প্রকৃতপক্ষে কোনক্রমেই মানুষ হিসাবে বিবেচিত হওয়ার যোগ্য নয় ।

'নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌র নিকট নিকৃষ্টতম জীব বধিত ও মূক যারা কিছুই বোঝে না ।'[২৩]

স্বাভাবিকভাবেই এ ধরনের ব্যক্তির সাথে ফলদায়ক কোন সংলাপ সম্ভব নয় । আর তাই তাদেরকে এক্ষেত্রে বাদ দেয়া উচিত ।

আমাদের ধর্মীয় বাণীসমূহে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে জ্ঞানের প্রতি শ্রদ্ধা পোষণের বিভিন্ন নির্দেশনা রয়েছে । সংক্ষেপে তার কিছু নিচে উল্লেখ করা হল :

১. অন্যান্য ধর্মীয় দায়িত্বের মতোই জ্ঞানার্জন মুসলমানদের জন্য অবশ্য কর্তব্য । নবী মুহাম্মাদ (সা.) বলেছেন :

'জ্ঞানার্জন প্রত্যেক মুসলিম নর-নারীর জন্য ফরয ।'[২৪]

২. শিক্ষাগ্রহণের জন্য কোন বয়স নেই :

মহানবী (সা.) বলেছেন, 'দোলনা থেকে কবর পর্যন্ত জ্ঞান অর্জন কর ।'[২৫]

৩. আঞ্চলিক সীমারেখা এক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয় :

মহানবী (সা.) বলেছেন, 'জ্ঞান অর্জন কর, এমনকি সেজন্য যদি তোমাকে চীন দেশও ভ্রমণ করতে হয় ।'

আর ইমাম মুহাম্মাদ ইবনে আলী আল বাকির (আ.) বলেছেন : 'যদি মানুষ জ্ঞানার্জনের কল্যাণ সম্বন্ধে জানত, তাহলে তারা উত্তাল সমুদ্র পাড়ি দেয়া অথবা নিজের জীবনের বিনিময়ে হলেও সেজন্য প্রচেষ্টা চালাত ।'[২৬]

৪. জ্ঞানার্জন কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তি অথবা সামাজিক গোষ্ঠীর ভেতরে সীমাবদ্ধ নয় :

উসূলে কাফী গ্রন্থে একজন পবিত্র ইমাম কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে : 'জ্ঞান মুমিনের হারানো সম্পদ । সুতরাং যেখানেই সে তা পাওয়ার আশা করবে সেখানেই যেন সে তা খোঁজ করে ।'[২৭]

অন্য বর্ণনাতে এ একই বক্তব্যের শেষে উল্লেখ করা হয়েছে : 'এমনকি যদি তা মুশরিকদের কাছ থেকেও তাকে শিখতে হয়' অথবা 'এমনকি যদি তা মুনাফিকদের কাছ থেকেও শিখতে হয় ।'

বিহারুল আনওয়ার গ্রন্থে অপর একটি হাদীসে বলা হয়েছে : 'তাগুতীদের কাছ থেকে হলেও সত্যকে গ্রহণ কর; আর তাগুতকে বর্জন কর, যদিও সত্যের অনুসারীরা তা প্রচার করে ।'[২৮]

অতঃপর মহান বাণীর এ হাদীসটিতে পরিপূরক হিসাবে বলা হয়েছে : 'কোন বক্তব্যের (গ্রহণ বা বর্জনের) ক্ষেত্রে অবশ্যই তোমার নিজেকেই তা বিচার করতে হবে ।'

অপর দিকে আমরা দেখতে পাই মুসলমানদেরকে তাদের আধ্যাত্মিক নেতারা মূর্খতা এবং দুর্বলচিত্ততার বিরুদ্ধে সতর্ক করেছেন। অজ্ঞতার বিষয়ে মুসলমানদের যে বিভিন্নভাবে সতর্ক করা হয়েছে তার কিছু উদাহরণ নিচে দেয়া হল :

১. অজ্ঞতা মানুষের জীবনকে দারিদ্র্য ও দুর্দশার দিকে ঠেলে দেয় ।

ইমাম আলী (আ.) বলেছেন : 'যখন আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর দাসদের মধ্য থেকে কাউকে দুর্দশায় নিপতিত করতে চান, তখন তিনি তাকে জ্ঞান থেকে বঞ্চিত করেন ।'[২৯] আর নবী (সা.)-এর সময়ের কথা উল্লেখ করতে গিয়ে আলী (আ.) বলেন যে, এমন এক সময়ে রাসূল (সা.)-এর আগমন ঘটে যখন জাহেলিয়াত তাদেরকে নির্বোধ মানুষে পরিণত করেছিল ।'[৩০] এটি খুবই স্বাভাবিক যে, একটি মূর্খ জাতি অভিশপ্ত জীবন-যাপন করবে। কেননা, সমুদয় বিশ্বজগৎ এবং মানবীয় সম্পর্কের সকল ক্ষেত্র সুগভীর জ্ঞানের ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত। সুতরাং একটি জ্ঞানহীন জাতি এমনকি প্রাত্যহিক জীবনের ক্ষেত্রেও অপরের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে ।

২. অজ্ঞতা অপশক্তি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হওয়ার পথ সুগম করে ।

ইমাম আলী (আ.) মানুষকে তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন :

ক. জ্ঞানী, যারা তাদের স্রষ্টাকে চেনে ।

খ. শিক্ষার্থী, যে তার মুক্তির জন্য প্রচেষ্টা চালায় এবং

গ. হতভাগ্য ব্যক্তি, যে পথভ্রষ্ট হয়ে ঘুরে বেড়ায় এবং যে কোন আহ্বানে সাড়া দেয়; যেমনটি মশা প্রত্যেক প্রবাহিত বায়ুর দ্বারা এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে ভেসে যায়। যার কাছে জ্ঞানের কোন আলো নেই এবং আশ্রয় নেবার মতো সুরক্ষিত কোন আশ্রয়স্থলও নেই।[৩১]

যে কোন অবস্থাতেই আল্লাহ্ তা'আলা বিশ্বাসীদের জন্য এ দায়িত্ব নির্ধারণ করেছেন, যে বিষয়ে তারা পুরোপুরি অবহিত নয় সে বিষয়ে যেন তারা জোরাজুরি না করে এবং কারও বিশুদ্ধতা সম্বন্ধে সুনিশ্চিত না হয়ে যেন তারা তার আহ্বানে সাড়া না দেয়:

'এবং যে বিষয়ে তোমাদের জ্ঞান নেই তার অনুসরণ কর না, নিশ্চয়ই কর্ণ, চক্ষু ও হৃদয় এ সকল কিছুই জিজ্ঞাসিত হবে।'[৩২]

উসূলে কাফী গ্রন্থে ইমাম সাদিক (আ.)-এর নিকট থেকে বর্ণিত হয়েছে : 'যদি জনগণ নিশ্চিত নয় এমন বিষয়ে গোঁড়ামি না করে এক মুহূর্তের জন্য ক্ষান্তি দেয় তাহলে তাদের শেষ পরিণতি অবিশ্বাসী অবস্থায় পর্যবসিত হবে না।'

খ. সকল মানুষের সমতার নীতি

'পরস্পর অপরিচিত ও সম্পর্কহীন মানবগোষ্ঠী একে অপরের সাথে বসবাসে বাধ্য হচ্ছে কি না'– এ প্রশ্নটি বর্তমানকালের চিন্তাবিদদের প্রায়ই আন্দোলিত করে। উদাহরণস্বরূপ 'আমরা কি এমন একটি দিনের প্রত্যাশা করতে পারি যখন পৃথিবীর সকলেই শান্তিপূর্ণভাবে সমঝোতাপূর্ণ পরিবেশে বসবাস করতে পারবে?'– এ প্রশ্নের উত্তরে আমরা বলতে পারি, যদি মানব জাতিকে জন্মগতভাবেই পারস্পরিক সম্পর্কহীনভাবে সৃষ্টি করা হয়ে না থাকে তাহলে হয়ত আমরা এমন এক দিনের সূর্যোদয়ের আশা করতে পারি।

এক্ষেত্রে দু'টি হাইপোথিসিস রয়েছে :

১. মানবজাতি পারস্পরিক সম্বন্ধহীন

থমাস হব্স (১৫৮৮-১৬৭৯)-এর মতো আর কোন দার্শনিকই বোধ হয় মানবজাতির পারস্পরিক সম্বন্ধহীনতার এ মতটিকে এত বিশদভাবে ব্যাখ্যা করেননি।

তাঁর যুক্তি অনুসারে, মানবজাতি নিজের স্বভাবগত কারণে একে অপরের শত্রু। সুতরাং সকলকে নিয়ন্ত্রণাধীন করার মতো একটি সুদৃঢ় কর্তৃত্বশীল সরকারের অবর্তমানে জনগণ একে অপরের সাথে শান্তিপূর্ণভাবে বসবাসের সুযোগ থেকে নিশ্চিতভাবেই বঞ্চিত হবে। বরং এক্ষেত্রে তারা বিরাট ক্ষতির সম্মুখীন হবে।

হব্‌সের তত্ত্বে বিচ্ছিন্নতা বা সম্পর্কহীনতার (alienation) দু'টি অর্থ আছে, যার মধ্যে একটি মানুষের মনস্তাত্ত্বিক দিকের সাথে সংশ্লিষ্ট। এ তত্ত্ব অনুযায়ী মানুষ কেবল তার সহজাত স্বার্থপরতার কারণে একে অপর থেকে বিচ্ছিন্ন ও সহানুভূতিহীন হয়ে ওঠে। হব্‌স বিশ্বাস করেন, প্রত্যেকেই প্রথমত তার অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার ব্যাপারে সচেষ্ট এবং এরপর সম্পদ, সামাজিক মর্যাদার মতো বিষয়গুলো আসে।

হব্‌সের মতে, মানুষ অন্য কারও ব্যাপারে ততক্ষণ পর্যন্ত মাথা ঘামায় না যতক্ষণ ঐ ব্যক্তি তার নিজের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য পূরণে সহায়ক ভূমিকা পালন অথবা তার আকাঙ্ক্ষা পূরণে বাধার সৃষ্টি না করে। সুতরাং মানুষের মনোযোগ কেন্দ্রীভূত হয় তার নিজের জীবনের কল্যাণ বিধানে এবং কী পরিমাণ ক্ষমতার নিয়ন্ত্রণ সে লাভ করতে পারে সে বিষয়ে।

হব্‌স বলেন, এই মনস্তাত্ত্বিক প্রবণতার জীবতত্ত্বগত ভিত্তিকে বিচ্ছিন্নতার অস্তিত্ববিদ্যাগত (ontological) দিক থেকে সবচেয়ে ভাল আখ্যায়িত করা যেতে পারে। অস্তিত্ব হচ্ছে বিচরণশীল বস্তুসমূহের সম্মিলিত অবস্থা। যে কোন বাস্তবতার একটি সুনির্দিষ্ট স্থান ও কাল থাকে এবং পদার্থবিদ্যার অপরিবর্তনীয় নীতিসমূহ সে বাস্তবতার ওপর তার নিয়ন্ত্রণ আরোপ করে।

মানুষ হচ্ছে সৌরজগতের জটিল কাঠামোর একটি ক্ষুদ্র কোষবিশেষ। মানুষ এবং একটি পাথর অথবা একটি গাছের একমাত্র পার্থক্য হল, মানুষের গঠন এদের চেয়ে অনেক বেশি জটিল। প্রকৃতিগত দিক থেকে মানুষ ও এ সকল বস্তুর মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। সুতরাং এক বস্তুর সাথে অপর বস্তুর সম্পর্ক মূলত তাদের গঠনের ওপর নির্ভরশীল। এ কারণে মানবতা, সহানুভূতি এবং অভিন্ন লক্ষ্যের মতো বিষয়গুলো মানুষে মানুষে ঐক্য সৃষ্টিতে অক্ষম।

মানুষের মাঝে ঐক্য কেবল তখনই সম্ভব, যখন তাদের সকলকে একটি দৃঢ় সামাজিক সত্তা নির্মাণে নিয়োজিত করা যাবে, যেমনটি বিভিন্ন ইট দিয়ে একটি দেয়াল নির্মাণ

করা হয়। তাদের প্রত্যেকেরই বিশেষ অবস্থান রয়েছে এবং কোন একটি উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে তারা একত্র হয়।

এ বিষয়টির সূত্র ধরেই নৈতিক আপেক্ষিকতাবাদের জন্ম হয়েছে। নৈতিক আপেক্ষিকতাবাদ অনুসারে কোন নৈতিক নিয়ম-নীতিই পরম নয়। সকল নৈতিক মূল্যবোধই হল সাংস্কৃতিক ক্রিয়াকলাপ যা উক্ত সংস্কৃতিতে শ্রদ্ধার চোখে দেখা হয় অথবা কেউ ব্যক্তিগতভাবে শ্রদ্ধা পোষণ করে তা মেনে চলে।

জন লিড বলেন, নৈতিক আপেক্ষিকতাবাদ অনুসারে নৈতিক কর্মকাণ্ডের ঠিক-বেঠিক নির্ভর করে যে সমাজে তা সংঘটিত হয় তার ওপর। এমন কোন সাধারণ নৈতিক রীতিনীতি নেই যা সকল সমাজে সকল সময়ে প্রয়োগ করা যেতে পারে।

রুথ বেনেডিক্ট বিষয়টিকে ভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করেন। তিনি বলেন, প্রত্যেক সভ্যতার সাংস্কৃতিক রূপ-বৈশিষ্ট্য গড়ে ওঠে সুবিস্তৃত মানবীয় উদ্দীপনা ও লক্ষ্য-উদ্দেশ্যের সমন্বয়ে। প্রত্যেক সংস্কৃতি বস্তুগত ও প্রযুক্তিগত অর্জন অথবা নির্দিষ্ট কিছু মূল্যবোধ ও চরিত্র থেকে লাভবান হয়। এ সকল বহুমুখী বিষয় যার মধ্যে সম্ভাব্য সকল মানবীয় চরিত্র সুদৃঢ়রূপে সন্নিবেশিত রয়েছে তা এত ব্যাপক ও এত জটিল যে, এমনকি একই সভ্যতার অধীন সকলের পক্ষে এর বিভিন্ন দিকের সুবিধাগুলো থেকে উপকার লাভ করা সম্ভব নয়। সুতরাং একটি নির্দিষ্ট একক সংস্কৃতির বিভিন্ন সুবিধা থেকে বাছাইকরণ হচ্ছে এক্ষেত্রে উপকার লাভের পূর্বশর্ত।[৩৩]

২. মানবজাতির সমতার তত্ত্ব

বহু চিন্তাবিদ মানুষকে যে সমতার ভিত্তিতে সৃষ্টি করা হয়েছে– এ ব্যাপারে জোরালো যুক্তি প্রদর্শন করেছেন। অ্যারিস্টোটল (খ্রিস্টপূর্ব ৩৮৪-৩২২) সম্ভবত এই তত্ত্বের সবচেয়ে বড় প্রবক্তা ছিলেন। তিনি বিশ্বাস করতেন, গাছের পাতাসমূহের যেমন তার শাখার সাথে এক অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক রয়েছে, মানুষকেও তেমনিভাবে যে সমাজে সে বাস করে, তার অচ্ছেদ্য সদস্য হিসাবে জীবন যাপন করতে হয়।

একজন বিচ্ছিন্ন ব্যক্তি যিনি সামাজিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করেন না বা করতে পারেন না, হয় তিনি এতটাই স্বাবলম্বী যে, কোন কিছুর মুখাপেক্ষী নন, যেমন স্রষ্টা নচেৎ অন্য কোন প্রাণী যার এ ধরনের কোন প্রয়োজন নেই।

এ তত্ত্বের সমর্থকরা এ কথা বলেন যে, আপেক্ষিকতাবাদ তত্ত্ব ভুলভাবে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে যে, কোন একটি সংস্কৃতির নির্দিষ্ট কিছু নিয়মনীতি একইভাবে অপর কোন সংস্কৃতির ক্ষেত্রে প্রাধান্য লাভ করতে পারে না। বিষয়টি এভাবে তাদের বিবেচনা করার মূল বিষয়টি কেবল এই যে, ভিন্ন ভিন্ন সংস্কৃতির ভিন্ন ভিন্ন সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ ও রীতিনীতি রয়েছে। প্রকৃতপক্ষে সুনির্দিষ্ট কোন নৈতিক মূল্যবোধ অপর কোন মূল্যবোধের ওপর প্রাধান্য পাবে কি না তা নির্ভর করে উভয় মূল্যবোধ কী লক্ষ্য অর্জন করতে চায় তার ওপর। আমরা বিশ্বাস করি যে, সমাজের টিকে থাকা, দুঃখ-যন্ত্রণার বিনাশ, উন্নয়ন, এগিয়ে নেয়া, চিন্তার বিকাশ এবং সামাজিক দ্বন্দ্ব-সংঘাতের ফলে মানুষের স্বার্থ ক্ষুণ্ন হলে তার যৌক্তিক সমাধানের নিশ্চয়তা বিধানের জন্য নৈতিক মূল্যবোধসমূহ প্রতিষ্ঠা করা হয়। এ সকল লক্ষ্য পূরণে সুনির্দিষ্ট কিছু অভিন্ন নীতির প্রয়োজন হয়, যা প্রকৃতপক্ষে সাংস্কৃতিক পার্থক্যসমূহের মূল এবং ভিত্তি হিসাবে কাজ করে। যেমনটি নৃতত্ত্ববিদগণ বলে থাকেন।

১৮ শতকের দার্শনিক ডেভিড হিউম এ সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, বিভিন্ন ঐতিহাসিককালে এবং বিভিন্ন সামাজিক পরিমণ্ডলে মানবীয় প্রকৃতি একই রকম ছিল। অতি সম্প্রতি সমাজিক জীববিজ্ঞানী ই ও উইলসন জাতি, ধর্ম, রাষ্ট্রীয় পরিচয় নির্বিশেষে মানুষের বিশটিরও অধিক অভিন্ন চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের তালিকা প্রণয়ন করেছেন।

ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি

ইসলাম ঐক্যের তত্ত্বে বিশ্বাস করে যেহেতু তা মানুষের সহজাত প্রকৃতির সাথে সামঞ্জস্যশীল। নৈতিক মূল্যবোধসমূহ একটি একক অভিন্ন নীতিমালা যা সকল মানুষের ক্ষেত্রে সকল সমাজ এবং সকল সময়ে প্রযোজ্য। যদিও অন্যান্য গৌণ নীতি সময়ের প্রয়োজনে পরিবর্তনের প্রয়োজন হতে পারে।

সুতরাং বস্তুগত সত্তার অধিকারী হওয়ার কারণে মানুষের বিবর্তনকে নৈতিক মূল্যবোধসমূহের বিবর্তনের সাথে গুলিয়ে ফেলা উচিত হবে না। যদি আমরা এ কথা মেনে নিই যে, নৈতিক মূল্যবোধসমূহ পরিবর্তন ও বিবর্তনের অধীন, সেক্ষেত্রে যে কোন গোষ্ঠী বা কোন আদর্শের অনুসারী এবং ভিন্ন ভিন্ন সময়ে বসবাসকারী

জনসাধারণের জন্য ভিন্ন ধরনের নৈতিক মূল্যবোধের প্রয়োজন হয়ে পড়বে। যা এক অর্থে মানুষের নৈতিক মূল্যবোধের প্রয়োজনকে একেবারেই অস্বীকার করার শামিল।

পবিত্র কুরআনে মানুষের অভ্যন্তরস্থ প্রকৃতির ব্যাপারে উল্লেখ করা হয়েছে :

'সুতরাং তুমি একনিষ্ঠভাবে নিজেকে ধর্মের ওপর প্রতিষ্ঠিত রাখ। এটিই আল্লাহ্‌র প্রকৃতি, যার ওপর তিনি মানব সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ্‌র সৃষ্টিতে কোন পরিবর্তন নেই; এটিই সরল ধর্ম। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ জানে না।'[৩৪]

এ আয়াতে ধর্মের অনুসরণকে সহজাত আকাঙ্ক্ষা হিসাবে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় আল্লামা তাবাতাবাঈ তাঁর অত্যন্ত মূল্যবান গ্রন্থ 'আল মিযান'-এ প্রমাণ করেছেন যে, মানব জাতির জন্য আশীর্বাদপুষ্ট অথবা হতভাগ্য হওয়ার অর্থ সকলের ক্ষেত্রে একই :

'যদি মানব জাতির কল্যাণ প্রাপ্তির বিষয়টি তাদের মধ্যে যে অমিল বিদ্যমান তার ওপর নির্ভরশীল হত, তাহলে একটি সুদৃঢ় হিতকর সমাজে যেখানে সকলেরই একটি কল্যাণকর জীবন যাপনের সুযোগ বিদ্যমান, তা সম্ভবপর হত না।

একইভাবে যদি পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে বসবাসকারী জনগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক রীতিনীতি বিশেষভাবে কেবল ঐ অঞ্চলের ক্ষেত্রেই প্রাসঙ্গিক বলে ধরে নেয়া হয় তাহলে মানব জাতির সমতার বিষয়টি আর বিবেচ্য হয় না।

মানব জাতির সুখ-শান্তির বিষয়টি যদি কোন নির্দিষ্ট ঐতিহাসিক সময়ের সাথে সম্পর্কিত হত, তাহলে বিভিন্ন যুগে বসবাসকারী সকল মানুষ সমান হিসাবে বিবেচিত হত না এবং বিভিন্ন সময়ে মানবসমাজের ঐক্যও ক্ষতিগ্রস্ত হত। আর মানব সমাজের বিবর্তিত হওয়াও সম্ভবপর হত না। মানবজাতি তখন অজ্ঞতা থেকে পূর্ণতার পানে ধাবিত হত না। কেননা, পূর্ণতা ও অপূর্ণতা তখন তাদের অর্থ হারিয়ে ফেলত। যদি অতীতের মানুষ আগামীকালের মানুষ থেকে একেবারেই ভিন্ন প্রকৃতির হত, সেক্ষেত্রে তাদের প্রত্যেকের কাছে পূর্ণতারও একটি ভিন্ন অর্থ তৈরি হত। সুতরাং ইতিহাসে পূর্ণতার দিকে মানুষের বিবর্তন তখনই অর্থবহ হয়, যখন সকল স্থান ও কালের মানুষ তাদের অভ্যন্তরে সুনির্দিষ্ট কিছু বিষয় ধারণ করে।'

এ যুক্তি তুলে ধরার মাধ্যমে, ধর্মীয় রীতিনীতি গড়ে ওঠার ক্ষেত্রে কোন কোন স্থান ও কালের যে প্রভাব রয়েছে তা আমরা অস্বীকার করতে চাই না। আমরা সাধারণত এ ব্যাপারে একমত যে, মানবজাতির মধ্যে কিছু কিছু ক্ষেত্রে এমনটি ঘটে থাকে।[৩৫]

এমনকি হযরত আলী (আ.) নবুওয়াতের দায়িত্ব অর্পণের দর্শন সম্বন্ধে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন : '...সুতরাং আল্লাহ একত্ববাদের শিক্ষাকে তাদের মধ্যে পুনর্জীবিত করতে, তাঁর অনুগ্রহসমূহ– যা তারা ভুলে গিয়েছিল তা স্মরণ করাতে ঐশী দাওয়াতের মাধ্যমে দৃঢ় যুক্তি উপস্থাপন এবং মৃত অন্তরগুলোকে জাগ্রত করতে তাদের (জনগণের) প্রতি তাঁর নবী প্রেরণ করেছেন এবং তাঁদের মধ্য থেকে একের পর এক রাসূল পাঠিয়েছেন।'[৩৬]

তাই নবীরা এসেছিলেন মানুষকে সচেতন করে তুলতে যে, তার আত্মার গভীরে, সহজাত প্রকৃতির গহীন কোণে এক অমূল্য সম্পদ চাপা পড়ে আছে, যা নষ্ট হয়ে যায়নি; কিন্তু উপেক্ষিত রয়েছে। অতএব, সত্য ও প্রজ্ঞা (কলা, সৌন্দর্য, ভালত্ব, প্রেম এবং উপাসনা) অন্বেষণে মানুষের যে ঝোঁক-প্রবণতা তার মূল প্রথিত রয়েছে মানুষের সহজাত প্রকৃতিতে, যার অর্থ হচ্ছে মানুষ দেহ ও আত্মার সমন্বয়ে এক সত্তা। আর তার আত্মার উৎস ঐশী–

'...এবং আমি তার মধ্যে আমার পক্ষ থেকে রূহ ফুঁকে দিলাম...'[৩৭] যা মানুষকে আধ্যাত্মিকতার সাথে সম্বন্ধিত করেছে। অপর দিকে তার দেহ–যা প্রাকৃতিক উপাদানে সৃষ্ট–প্রকৃতির সাথে সম্পর্কযুক্ত করেছে।

ইমাম আলী (আ.) মালিক আশতারের নিকট লেখা তাঁর বিখ্যাত চিঠিতে মানুষের বর্ণনা দিয়েছেন এভাবে : 'জনগণ হয় তোমার দ্বীনি ভাই অথবা তারা তোমার মতো একই রকম সৃষ্ট মানুষ।'[৩৮]

পারস্যের কবি রুমি তাঁর শামসে তাররীজ এর দিওয়ান-এ বলেছেন : 'কেন এত বেদনা, উদ্দেশ্যহীনতা আর অসংগতি? আমরা কি একই কাফেলার পথিক নই যাদের উৎসও এক?'

মূল কথা হচ্ছে, আল্লাহর নবী (সা.) এ পৃথিবীতে যা নিয়ে এসেছিলেন, প্রকৃতপক্ষে মানুষের অস্তিত্বের গভীরে তার প্রয়োজনীয়তা ছিল।

গ. বিশ্বাস ও পথ নির্বাচনের স্বাধীনতা

একত্ববাদী ধর্মের অনুসারীরা বিশ্বাস করে যে, এ পৃথিবীতে বেঁচে থাকার প্রকৃত লক্ষ্যই হচ্ছে পরকালে কল্যাণকর জীবন লাভ করা। সে লক্ষ্য পূরণে তাদের স্রষ্টার প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস থাকতে হবে এবং ধর্মীয় দায়িত্বসমূহ পালন করতে হবে। অন্যথায় শুধু মানবীয় প্রজ্ঞার অনুসরণ, এমনকি শুভ গুণসমূহ ও মানবিক আইন মেনে চলা পরজগতে কল্যাণকর জীবনের নিশ্চয়তা বিধান করে না।

কিন্তু স্রষ্টা ও পরকালে বিশ্বাস যদি অনন্ত মুক্তির মহানিয়ামক হয়ে থাকে তাহলে জনগণকে চূড়ান্ত কল্যাণের দিকে পরিচালিত করার জন্য সমাজের জ্ঞানী ব্যক্তিবর্গের কী করা উচিত?

কিছু সংখ্যক তাত্ত্বিক বিশ্বাস করেন, অনন্ত শাস্তি থেকে মানুষকে বাঁচাতে শক্তি প্রয়োগের আশ্রয় নেয়া উচিত। মধ্যযুগে সেইন্ট অগাস্টিন ছিলেন তাঁদেরই একজন। তিনি তাঁর এ বিশ্বাসকে এভাবে ন্যায্যতা দান করেন যে, যদি কারও অবিশ্বাসের কারণে অনন্তকাল শাস্তি ভোগের সম্ভাবনা থাকে, তাহলে সেক্ষেত্রে তাকে জোর করে বিশ্বাসীতে পরিণত করাই উত্তম। পরিণামে এর মাধ্যমে তার জন্য অনন্ত কল্যাণকর জীবন নিশ্চিত হবে।

তিনি বলেন যে, শক্তি প্রয়োগ একটি কল্যাণকর পন্থা যা আসলে প্রশংসিত হওয়া উচিত। কেননা, যে ব্যক্তিকে জোর করে বিশ্বাসীতে পরিণত করা হচ্ছে তা তার জন্য পুরস্কার বয়ে আনে।

সেইন্ট অগাস্টিনের মতানুযায়ী এমনকি কোন অবিশ্বাসী যদি অত্যাচারের ফলে মারাও যায় তাহলে তা জাহান্নামে সে যে শাস্তির সম্মুখীন হবে তার তুলনায় কিছুই নয়। এ ধরনের কষ্ট ভোগের মাধ্যমে একজন অবিশ্বাসীর অনন্ত মুক্তি হয়ত নিশ্চিত করা সম্ভব। সুতরাং এ সকল ব্যক্তি অল্প কিছুকালের জন্য নির্যাতিত হয় ও কষ্টভোগ করে যাতে তারা চিরস্থায়ী যন্ত্রণা ভোগ থেকে চিরমুক্তি লাভ করে জান্নাতে যেতে পারে– যা প্রকৃতপক্ষে ঐ অত্যাচার ও যন্ত্রণা ভোগের বিপরীতে এক মূল্যবান পুরস্কার।

অপরদিকে কিছু সংখ্যক ধর্মীয় পণ্ডিত কেবল স্বেচ্ছায় একজন বিশ্বাসীর অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে স্রষ্টার প্রতি বিশ্বাসকেই স্বীকৃতি দিয়ে থাকেন। তাঁদের যুক্তি অনুযায়ী, শক্তি প্রয়োগ কখনই আন্তরিক ও প্রকৃত বিশ্বাসের পথে পরিচালনা করে না।

জন লকের মতানুসারে নির্যাতন, নিপীড়ন কখনই কার্যকর কোন পন্থা হতে পারে না। কারণ, কারও ওপর শক্তি প্রয়োগ করে তাকে দিয়ে হয়ত খুশিমত কিছু করে নেয়া যেতে পারে; কিন্তু তাকে জোর করে বিশ্বাস করানো সম্ভব নয়।

তিনি বলেন, শক্তি প্রয়োগের আশ্রয় গ্রহণের ফল হচ্ছে ভণ্ডামি, কপটতা এবং মিথ্যা ধার্মিকতা। সুতরাং জনগণের বিশ্বাসকে দৃঢ় করতে নির্যাতনের নীতি গ্রহণ নৈতিক দিক থেকে ভ্রান্ত এবং অত্যন্ত ক্ষতিকর। উপরন্তু এ ধরনের পন্থা না ধার্মিক বিশ্বাসী তৈরি করবে, আর না তা অবিশ্বাসীদের চিরমুক্তি বিধান করবে।

পবিত্র কুরআনের কতিপয় আয়াত রয়েছে যেখানে মানুষকে তার পথ বেছে নেয়ার স্বাধীনতা এবং তার সে পছন্দের পরিণামের দায়িত্বের বিষয়টি বারংবার উল্লেখ করা হয়েছে। সুতরাং মানুষকে, কেন সে কোন একটি পথ অপর একটি পথের বিপরীতে বেছে নিল তা ব্যাখ্যায় সক্ষম হতে হবে।

'ধর্মের ক্ষেত্রে কোন জবরদস্তি নেই; সত্য সুস্পষ্টরূপে মিথ্যা থেকে পৃথক হয়ে গিয়েছে...।'[৩৯]

এর অর্থ হচ্ছে ধর্ম ঐশী সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত যা অত্যন্ত দৃঢ়। অন্যথায় 'ধর্মের ক্ষেত্রে কোন জবরদস্তি নেই'– এ বাক্যটি অর্থহীন হয়ে যায়। জবরদস্তির অর্থ হচ্ছে স্বাধীন ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও কোন কিছু বাধ্য হয়ে গ্রহণ করা। কিন্তু যদি কোন মতবাদ বা চিন্তা সুস্পষ্ট ও সহজবোধ্য হয় যা সুদৃঢ় যুক্তি প্রমাণের ওপর প্রতিষ্ঠিত এবং মানুষকে যদি তা গ্রহণ করা বা না করার ব্যাপারে স্বাধীনতা দেয়া হয় তাহলে নিশ্চিতভাবেই সেক্ষেত্রে কাউকে বাধ্য করার কোন সুযোগ থাকে না।

নিচের এ আয়াত থেকে আমরা বুঝতে পারি যে, প্রত্যেকে তার নিজস্ব পথ বেছে নেয়ার ক্ষেত্রে দায়িত্বশীল :

'বল, সত্য তোমার রবের পক্ষ থেকে; অতঃপর যার ইচ্ছা সে গ্রহণ করুক অথবা যার ইচ্ছা তা বর্জন করুক।'[৪০]

'তোমার রব ইচ্ছা করলে পৃথিবীতে যারা আছে তাদের সকলকেই বিশ্বাসী করতেন; তবে কি তুমি বিশ্বাসী হওয়ার জন্য মানুষের ওপর জবরদস্তি করবে?'[৪১]

'আর যদি আল্লাহ ইচ্ছা করতেন তবে তারা শির্ক করত না এবং আমি তোমাকে তাদের রক্ষক নিযুক্ত করিনি।'[৪২]

এ সকল আয়াত নবী (সা.)-কে অবিশ্বাসীদের ধার্মিক মুসলমানে পরিণত করতে বাধ্য না করতে উপদেশ দান করে। বরং জনগণ গ্রহণ করুক বা না করুক তাদের কাছে কেবল একত্ববাদের শিক্ষা উপস্থাপনের কথা বলে। এমনকি অপর একটি আয়াতে আল্লাহ তা'আলা পুনরায় জানিয়ে দেন যে, তাঁর রাসূলের দায়িত্ব শুধু তাঁর বাণী পৌঁছে দেয়া :

'সুতরাং তুমি উপদেশ দাও, তুমি তো উপদেষ্টা, তুমি তো তাদের কর্মবিধায়ক নও।'[৪৩]

এ সকল আয়াতসহ কুরআনের অন্যান্য আয়াত বার বার এ বিষয়টিই উল্লেখ করে যে, বিভিন্ন চিন্তা ও মতের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করতে হবে, এমনকি কোন সঠিক মত জোর করে চাপিয়ে দেয়া যাবে না। কেননা, কোন সুস্থমস্তিষ্ক এ ধরনের পন্থাকে সমর্থন দেবে না। আর তা প্রকৃতপক্ষেই অযৌক্তিক।

আল্লাহ তা'আলা কুরআনের অন্য আয়াতে বিভিন্ন জাতি ও গোষ্ঠী সৃষ্টির পিছনের কারণ ব্যাখ্যা করেছেন :

'যদি তোমাদের রব ইচ্ছা করতেন তাহলে সকলকে এক জাতিতে পরিণত করতে পারতেন এবং তারা মতভেদ করত না।'[৪৪]

'যদি তোমাদের রব ইচ্ছা করতেন, তাহলে তোমাদের একই জাতিতে পরিণত করতে পারতেন, কিন্তু তিনি তাঁর প্রদত্ত বস্তু দিয়ে তোমাদের পরীক্ষা করতে চান।'[৪৫]

এ সকল আয়াত থেকে আমরা একটি উপসংহারই টানতে পারি। আর তা হল, কাউকে কোন ধর্মে বা অন্য কোন মতবাদে বিশ্বাস স্থাপনে বাধ্য করা যাবে না। মানুষকে হয়ত কোন নির্দিষ্ট বিষয়ে মুখ বন্ধ রাখতে বাধ্য করা যেতে পারে, কিন্তু আমরা যেভাবে চাই সেভাবে তাদেরকে চিন্তা করতে বাধ্য করাটা অসম্ভব। একটি

বিশ্বাসকে সর্বান্তকরণে গ্রহণ করতে হলে সুস্পষ্ট কারণ ও খাঁটি যুক্তির ওপর নির্ভর করতে হবে।

নিশ্চিতভাবেই সৎকাজের প্রসার ও অন্যায় কাজ প্রতিহত করার নিজস্ব যথাযথ ক্ষেত্র রয়েছে। কিন্তু সংক্ষেপে বলতে গেলে এ ক্ষেত্রেও সর্বোত্তম নীতি হচ্ছে জ্ঞানালোক প্রাপ্তি। জবরদস্তি নয়।

অনুবাদ : এস.এম. আশেক ইয়ামিন

তথ্যসূত্র

১. এ ধরনের সংলাপ দেখেতে পাওয়া যায় কেইন ও অ্যাবেলের মধ্যে যেখানে তারা কী কুরবানী করবে সে ব্যাপারে সম্মত হয়।

২. 'আল ইমামুস সাদ্‌র ওয়াল হিওয়ার' বিষয়ে আন্তর্জাতিক সম্মেলনে উপস্থাপিত আরবি প্রবন্ধ 'কালিমাতুস সাওয়া', প্রকাশক : শিরকাতিল মাতবুআত-ই লিততাওযী ওয়ান নাস্‌র, পৃ. ৯৫

৩. মুকারিনাত-উল-আদইয়ান, ড. আহমাদ শালবি, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৭, অস্টম প্রকাশ (১৯৮৮), প্রকাশনী : মাকতাব-উন-নিযহাত-উল-মিসরীয়াহ

৪. সূরা বাকারা : ১১৩

৫. প্রাগুক্ত

৬. সূরা বাকারা : ৩০-৩২

৭. সূরা আরাফ : ১২-১৮

৮. সূরা হূদ : ৩২

৯. সূরা হূদ : ৪৫-৪৭

১০. সূরা হূদ : ৭৪

১১. সূরা নাহল : ১২৫

১২. কুরআনের কিছু ব্যাখ্যা অনুযায়ী কিছু সংখ্যক লোক আছে যাদেরকে প্রজ্ঞা ও যৌক্তিক ব্যাখ্যার মাধ্যমে পরিচালিত করা সম্ভব। কিন্তু কিছু সংখ্যক ব্যক্তি আছে যারা এ ধরনের যুক্তিতর্ক বুঝতে অক্ষম। পরবর্তী এ গোষ্ঠীকে উপদেশ, নৈতিকতাপূর্ণ গল্প ও কাহিনীর মাধ্যমে পরিচালিত করতে হয়। তৃতীয় একটি গোষ্ঠী রয়েছে যারা সবসময়

দোষ খুঁজে বের করতে উদগ্রীব। নবী (সা.)- কে এদের সাথে সর্বোত্তম উপায়ে বিতর্কে লিপ্ত হতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এর অর্থ হচ্ছে যুক্তিতর্কের ক্ষেত্রে স্বচ্ছ হওয়া, কোন অন্যায় পদ্ধতি গ্রহণ না করা এবং বিজয় লাভের উদ্দেশ্যে মিথ্যা না বলা।

১৩. সূরা আনকাবূত : ৬

১৪. সূরা নূহ : ২১; আশ শুআরা : ১৩০ ও ১৫১; সূরা আম্বিয়া : ৫৪; সূরা ত্বহা : ৪৭; সূরা যুখরুফ : ৬৩;

১৫. সূরা যুখরুফ : ৮৭; সূরা আনকাবূত : ৬১ ও ৬৩; সূরা লুকমান : ২৫; সূরা যুমাররর : ৩৮; সূরা যুখরুফ : ৯

১৬. সূরা যুমার : ৩

১৭. সূরা ইউসুফ : ১০৬

১৮. মুহাম্মাদ আবু যুহরা 'তারিখুল জাদাল' গ্রন্থে (দার-উল-ফিক্‌র-উল-আরাবি কর্তৃক প্রকাশিত, ১৯৩৪) মানুষে মানুষে ভেদাভেদের ১০টি উৎস উল্লেখ করেছেন।

১৯. সূরা ফুসসিলাত : ৩৪

২০. সূরা যুমার : ১৮

২১. মোল্লা মুহাম্মাদ বাকির মাজলিসী, বিহারুল আনওয়ার, ৭৫তম খণ্ড, পৃ. ২৯৬, বৈরুত থেকে প্রকাশিত; কুলাইনী, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৪

২২. আল মিযান ফি তাফসিরিল কুরআন, ২৩তম খণ্ড, পৃ. ২৫১

২৩. সূরা আনফাল : ২২

২৪. কুলাইনী, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৫

২৫. মোল্লা মুহসিন ফায়েজ কাশানী, মাহাজ্জাত উল বাইদাহ, (কোম : ইসলামিক পাবলিকেশন্স অফিস), ১৯৯৫, ১ম খণ্ড, পৃ. ২১

২৬. কুলাইনী, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৫

২৭. প্রাগুক্ত, ৮ম খণ্ড, পৃ. ১৬

২৮. মোল্লা মুহাম্মাদ বাকির মাজলিসী, বিহারুল আনওয়ার, ২য় খণ্ড, পৃ. ৯৬,

২৯. নাহজুল বালাগা,

৩০. প্রাগুক্ত, খুতবা নং ৯৪

৩১. প্রাগুক্ত, বাণী নং ১৩৯

৩২. সূরা আল ইসরা : ৩৬

৩৩. Benedict Ruth, Patterns of Culture : New York Press, 1942, p. 219
৩৪. সূরা রূম : ৩০
৩৫. আল্লামা মুহাম্মাদ হোসেইন তাবাতাবাঈ, আল মিযান (ফারসি অনুবাদ), ৩১তম খণ্ড, পৃ. ২৮৭-৮৮
৩৬. নাহজুল বালাগা, খুতবা নং ১
৩৭. সূরা সাদ : ৭২
৩৮. নাহজুল বালাগা, পত্র নং ৫৩
৩৯. সূরা বাকারা : ২৫৬
৪০. সূরা কাহ্‌ফ : ২৯
৪১. সুরা ইউনুস : ৯৯
৪২. সূরা আনআম : ১০৭
৪৩. সূরা গাশিয়াহ : ২১-২২
৪৪. সূরা হূদ : ১১৮
৪৫. সূরা মায়িদাহ : ৪৮

(সূত্র : তেহরান থেকে প্রকাশিত ত্রৈমাসিক ম্যাগাজিন আল তাওহীদ থেকে প্রবন্ধটি নেয়া হয়েছে)

আপনার জিজ্ঞাসা

আমাদের এ সংখ্যার প্রশ্নকর্তা হলেন মো: ইমরান হোসেন, মাধবপাশা, বরিশাল থেকে। নিম্নে তাঁর প্রশ্নের উত্তর প্রদান করা হল।

প্রশ্ন : ইসলামে কা'বাঘরকেন্দ্রিক ইবাদাতের বিধান কি প্রতিমা পূজার সাথে তুলনীয় নয়? এ দুয়ের মধ্যে পার্থক্য কোথায়?

উত্তর : ইসলাম একত্ববাদের ধর্ম। শির্ক তথা পৌত্তলিকতাবাদের কোন স্থানে এতে নেই। অংশীবাদকে ইসলামে অপবিত্র ঘোষণা করা হয়েছে। শুধু তা-ই নয়, কুরআনের ঘোষণা হল : 'আল্লাহ সকল গোনাহ মার্জনা করবেন। কেবল শির্ক ছাড়া।' আর মূর্তিপূজা হল অংশীবাদের জ্বলন্ত উদাহরণ। এ কারণে মহানবী (সা.) আপোষহীনভাবে পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছেন। মক্কা বিজয়ের পর তিনি সর্বপ্রথম যে কাজটি করেন সেটা হল হযরত আলী (আ.)-এর সাহায্য নিয়ে কা'বাঘরের অভ্যন্তর থেকে ছোট-বড় সকল মূর্তি নির্মূল করা। এটা শুধু মহানবী (সা.)-ই নন, আল্লাহর সকল পয়গম্বর এ ব্যাপারে নিরন্তর সংগ্রাম চালিয়েছেন। হযরত ইবরাহীম (আ.) কর্তৃক মূর্তি ভাঙ্গার বিখ্যাত ঘটনা আমাদের সবারই জানা।

ইসলাম মূর্তিপূজা থেকে এতটাই বিমুখ যে, এর তাওহীদের (একত্ববাদের) দাওয়াতের সূচনা থেকে যাতে মুসলমানরা (যারা সবেমাত্র পৌত্তলিকতা ছেড়ে ইসলাম গ্রহণ করেছিল) কোনভাবেই মূর্তির দিকে মনোযোগী না হয় সেজন্য তাদের কা'বাঘরের দিকে ফিরে নয়; বরং বাইতুল মুকাদ্দাসের দিকে ফিরে নামায পড়ার নির্দেশ জারী করেছিল। যাতে তাদের দেহ-মন সর্বান্তকরণে যে কোন ধরনের পৌত্তলিকতা ও অংশীবাদী ধ্যান-ধারণার ছোঁয়া থেকে পবিত্র থাকে। কারণ, কা'বা তখনও ছিল মূর্তিপূজকদের মূল প্রতিমালয়।

ইসলামের দীনি শিক্ষার আদর্শ হল আল্লাহ এক ও অদ্বিতীয়। তিনি অশীরীরি, নিরাকার। আর আল্লাহ-বিশ্বাসী ধর্মপ্রাণ মানুষ কোন মাধ্যম ছাড়াই তার অন্তর্যামী অর্থাৎ আল্লাহর সাথে যোগাযোগ স্থাপনে সক্ষম। তাঁর কাছে নিজের মনের কামনা নিবেদন করতে এবং তাঁর কাছে ভুল-ভ্রান্তির জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতে পারে।

এবার মূল প্রশ্নের উত্তরে আসা যাক। নিম্নোক্ত রেওয়ায়াতে উপরিউক্ত প্রশ্নের যথাযথ উত্তর খুঁজে পাওয়া যেতে পারে। ইবনে আবিল আওজা একজন কাফের, জিন্দিক (নাস্তিক) ও মুলহিদ ব্যক্তি হিসাবে পরিচিত ছিল। একদিন সে হজের মৌসুমে তার মতানুসারী একদল লোক নিয়ে মসজিদুল হারামে বসেছিল এবং হাজীবৃন্দের তাওয়াফ, সাঈ ইত্যাদি হজের আমলগুলো পর্যবেক্ষণ করছিল। এসব দেখে তারা ঠাট্টা-বিদ্রূপ ও হাসাহাসি করছিল। মসজিদের আরেক স্থানে ইমাম সাদিক (আ.) অসংখ্য অনুসারী নিয়ে বসেছিলেন। তারা এ মহান ইমামের আসমানী জ্ঞানের ফায়েয লাভ করে চলেছিল।

এমন সময় ইবনে আবিল আওজা ইমামের মজলিসের নিকটবর্তী হয়ে বলল : 'আর কতদিন এ খড়কুটোকে গুড়ো করবেন... এবং এ পাথর ও কাদার ঘরের ইবাদাত করবেন। আর চমকে ওঠা উটের পালের মতো ঐ ঘরের চারপাশে পড়বেন ও উঠবেন? যে কেউ এ ঘরের আচার-অনুষ্ঠানের ব্যাপারে চিন্তা করবে সে বুঝতে পারবে যে, এগুলোর নির্দেশদাতা বিচক্ষণতা ও প্রজ্ঞাবিবর্জিত ছিল।'

ইমাম সাদিক (আ.) উত্তর দিলেন : 'এ (কা'বা) হল এমন ঘর যা প্রজ্ঞাবান আল্লাহ তাঁর বান্দাদের পরীক্ষা করার মাধ্যম হিসাবে নির্ধারণ করেছেন এবং তাদেরকে এর সম্মান ও যিয়ারত করার নির্দেশ প্রদান করেছেন। যাতে এটা মহান আল্লাহর দরবারে বান্দাদের ইবাদাত ও বিনায়বনত হওয়ার ক্ষেত্রে নিষ্ঠা ও আত্মসমর্পণের দীপ্যমান মাপকাঠি হয়। আর নিখাঁদ ঈমানদার ও মহান আল্লাহর নির্দেশের নিষ্ঠাবান আনুগত্যকারীরা ঈমানহীন মুনাফিক লোকদের থেকে পৃথক হয়ে যায়। এ হল নবিগণের অবস্থান স্থল এবং নামায আদায়কারীদের কিবলা। আর পরম দয়াময় মহান আল্লাহর ক্ষমা ও সন্তুষ্টি অর্জনের পথস্বরূপ। কাজেই, এখানে পাথরকে পূজা করাও উদ্দেশ্য নয়, মূর্তির ইবাদাত করাও উদ্দেশ্য নয়; বরং উপাস্য হলেন মানবের দেহ ও প্রাণের স্রষ্টা, যিনি যমিন ও আসমানের স্রষ্টাও বটে। এ গৃহের প্রতি সম্মান প্রদর্শন এবং এ পাথরকে চুম্বন করা মূলত আল্লাহর নির্দেশ পালনার্থেই।'[১]

এ কারণেই আখলাক শাস্ত্রের পণ্ডিতগণ বলেন : 'যখন হজ পালনকারীর চোখ কা'বা ঘরের ওপরে পড়ে, তখন তার এ ঘরের মহিমা উপলব্ধিতে আনা উচিত এবং এমন কল্পনা করা উচিত যেন ঘরের মালিককে দর্শন করছে। আর আশা পোষণ করবে যেন তাকে তাঁর সাথে সাক্ষাতের সৌভাগ্য দান করেন, যেমনভাবে তাঁর ঘরের সাক্ষাৎ করার সৌভাগ্য তাকে প্রদান করেছেন। আর আল্লাহর প্রতি শুকরিয়া জ্ঞাপন করবে। কেননা, তিনি তাকে নিজের ঘরে এনে পৌঁছিয়েছেন এবং তাঁর অতিথিবৃন্দের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। সে আরও স্মরণ করবে কিয়ামতের কথা, যেদিন সকল সৃষ্টি বেহেশত লাভের আশা-নিরাশায় দুলতে থাকবে।'[২]

এখন কা'বাঘর যিয়ারত ও মসজিদুল হারামে ইবাদাত করা আর মূর্তিপূজা ও প্রতিমালয়ে উপাসনা করার মধ্যে পার্থক্য স্পষ্ট হয়ে গেল যে, মূর্তিপূজকরা স্বয়ং মূর্তির পূজা করে। আর তাদের পাথর বা কাঠের মূর্তিগুলোর সুরক্ষার জন্য প্রতিমালয় নির্মাণ করে। কিন্তু কা'বা নির্মাণ হয়েছে আল্লাহর নির্দেশে জমিনের ওপরে তাঁরই চিহ্ন হিসাবে, যা ইতিহাসের শুরু থেকেই নির্মিত হয়েছে।

মসজিদুল হারাম, যা কা'বাঘরকে বেষ্টন করে অবস্থিত, এর ইতিহাস খোদ কা'বা ঘরের ইতিহাসেরই সমান। সাক্ষ্য-প্রমাণ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, হযরত আদম (আ.) ছিলেন এর প্রতিষ্ঠাতা। পরবর্তীকালে হযরত ইবরাহীম (আ.) ও হযরত ইসমাঈল (আ.) এর পুনঃনির্মাণ করেন। মসজিদুল হারাম হল জমিনের বুকে সর্বশ্রেষ্ঠ মসজিদ। কুরআন মহা সম্মানে এর স্মৃতিচারণ করেছে এবং কাফের ও মুশরিকদের জন্য এর তত্ত্বাবধান তো দূরের কথা, এর ভেতরে প্রবেশকেই নিষিদ্ধ করেছে।

আল্লাহর মহান নবিগণ এবং তাঁর সৎকর্মশীল (সালেহ) ও সত্যবাদী (সিদ্দীক) বান্দাগণ এ ঘরে উপস্থিত হয়েছেন এবং আল্লাহর ইবাদাত-বন্দেগী করেছেন। অন্য সব মসজিদও তাঁরই ইবাদাত ও তাঁর কাছে দো'আ করার স্থান, মুসলমানদের সমাবেত হওয়ার স্থান ও ঐক্যের কেন্দ্র। শুধু পবিত্র লোকেরাই এর মধ্যে প্রবেশ করতে পারে। আর স্বয়ং আল্লাহ মসজিদের গুণ-বর্ণনা করেছেন এরূপে :

'জমিনে মসজিদগুলোই হল আমার ঘর। এ ঘর আসমানবাসীর জন্য জ্বলতে থাকে, যেমনভাবে আকাশের তারকারাজি যমিনের বাসিন্দাদের জন্য আলো ছড়াতে থাকে। ধন্য সেই বান্দা, যে তার নিজের ঘরে ওযু গ্রহণ করে, অতঃপর আমার ঘরে আমাকে যিয়ারত করে..।'[৩]

এখন আপনিই আল্লাহর মসজিদগুলোকে অন্যান্য উপাসনালয়ের (মন্দির, গীর্জা ...) সাথে তুলনা করুন এবং এদের পার্থক্য চিত্রিত করুন।

তথ্যসূত্র

১. বিহারুল আনওয়ার, ১০ম খণ্ড, পৃ. ২০৯

২. জামেউস সা'দাত, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩৯১; হাজ্জে আরেফান, পৃ. ১০৭;

৩. ওসায়িলুশ শিয়া, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৬৮

প্লেটোনিক ধারণা প্রসঙ্গে[১] সাদরুল মোতাআল্লেহীন[২]

যাহ্‌রা মোস্তাফাভী

উপস্থাপনা

ইসলামের ইতিহাসে যুগে যুগে এমন কিছু সংখ্যক চিন্তাবিদ ও মনীষী আবির্ভূত হয়েছেন যাঁরা ইসলাম সম্পর্কিত বিভিন্ন ধরনের জ্ঞান-বিজ্ঞানের মধ্যকার দূরত্ব হ্রাস করার জন্য গভীর আন্তরিকতা সহকারে নিরলস পরিশ্রম করেছেন। এ ক্ষেত্রে অতীতের ইসলামী মনীষিগণ যে সব গুরুত্বপূর্ণ খেদমত আঞ্জাম দিয়েছেন তার অন্যতম ছিল এই যে, তাঁরা ইসলামের আওতাভুক্ত বিভিন্ন চিন্তা, মতাদর্শ ও গবেষণা পদ্ধতির মধ্যে সংযোগ ও সমন্বয় সাধন করেছেন। এর ফলে দেখা গেছে যে, ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানের কতগুলো শাখার মধ্যে কিছু বিষয় পরস্পর অভিন্ন হয়ে ধরা পড়েছে এবং এসব বিষয় পরস্পরকে প্রভাবিত করেছে। এ সব বিষয়ের মধ্যে ছিল প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, দর্শন, ইলাহিয়্যাত্ (الهيات–ইলাহীতত্ত্ব/ ঈশ্বরতত্ত্ব), 'ইরফান (عرفان–আল্লাহ্‌র সাথে সৃষ্টির সম্পর্ক বিষয়ক আধ্যাত্মিক জ্ঞান/অধ্যাত্মবাদ), কুরআন মজীদের তাফসীর ও ফিকাহ্। উদাহরণস্বরূপ, ইসলামের ইতিহাসে এমন কিছু সংখ্যক মনীষী ছিলেন যাঁরা দর্শনে বিশেষজ্ঞ ছিলেন, আবার তাঁরা ইলাহিয়্যাতের বিতর্কে অংশগ্রহণ করেছেন; তেমনি এর বিপরীত দৃষ্টান্তও রয়েছে। আবার এমন অনেক মনীষীও ছিলেন যাঁরা প্রথমে 'ইরফানে (অধ্যাত্মবাদ) অবগাহন করেন এবং পরে দার্শনিক আলোচনার দিকে ঝুঁকে পড়েন।

অনেক আগে এমন অনেক মুসলিম মনীষী ছিলেন যাঁরা একই সাথে বিভিন্ন শাস্ত্রে পা-িত্যের অধিকারী ছিলেন এবং এ সব শাস্ত্রের বিভিন্ন বিষয়ে অভিসন্দর্ভ লিখে গেছেন। এমনটি এ কারণে ঘটেনি যে, তখন জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার উদ্ভব হয়নি; বরং তাঁরা জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার মধ্যে সমন্বয় সাধনের উদ্দেশ্যেই তা করেছিলেন।

এসব মনীষীর মধ্যে খাজা নাসিরুদ্দীন তূসী দর্শন ও ইলাহিয়্যাতের মধ্যে সুদৃঢ় সংযোগ সৃষ্টির ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখেন। এদিক থেকে তিনি ইমাম গাযযালী, তাফতাযানী ও ইমাম ফাখরে রাযীর ন্যায় ব্যক্তিত্ববর্গ থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ছিলেন। তিনি ইসলামী ইলাহিয়্যাতের অস্ত্র নিয়ে দর্শনের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে অবতীর্ণ হননি। তেমনি তিনি দর্শনের মতো মানবিক শাস্ত্রসমূহকে ইলাহিয়্যাতের আলোচনার সাথে সংমিশ্রিত করেও ফেলেননি; বরং তিনি দর্শন ও মানবিক বিচারবুদ্ধির অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে ইলাহিয়্যাতের জটিলতার গ্রন্থি উন্মোচনের চেষ্টা করেছেন। তিনি শিয়া মাযহাবের ইলাহিয়্যাতকে দার্শনিক চিন্তাধারার ওপর দাঁড় করান এবং এভাবে তিনি জ্ঞানপিপাসুদের সামনে একটি নতুন পথ নির্মাণ করে দেন।

খাজা নাসিরুদ্দীন তূসীর পরে 'মোল্লা সাদ্‌রা' নামে সমধিক পরিচিত সাদরুল মোতাআল্লেহীন শীরাযী ইসলামী শাস্ত্রসমূহের পুনর্গঠনের জন্য কাজ করেন। তিনি 'ইরফান, দর্শন ও ইলাহিয়্যাত্–এ তিনটি বিষয়কে পরস্পর সংযুক্ত করার জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা চালান। তিনি কেবল খাজা নাসিরুদ্দীন তূসীর ন্যায় ইলাহিয়্যাতের বিতর্ককে দার্শনিক চিন্তাধারার ওপর দাঁড় করাননি; বরং দর্শনকে সমৃদ্ধ করার লক্ষ্যে আরও একটি পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। তিনি ইসলামী 'ইরফানের সাথে গভীরভাবে সুপরিচিত ছিলেন এবং এর ভিত্তিতে ইসলামী 'ইরফানের বিষয়গুলোকে দর্শনের ভাষায় ও 'ইরফানী পদ্ধতিতে উপস্থাপনের চেষ্টা করেন। এভাবে তিনি 'ইরফানী উদ্ভাবন (কাশ্‌ফ্)-এর ভিত্তিতে দর্শনকে উপস্থাপন করেন।

এ মহান লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার উদ্দেশ্যে মোল্লা সাদরা 'ইরফানী পরিভাষা ও দাবীসমূহ পরিত্যাগ করেন। দর্শনের ভিতরে অনুরূপ তাৎপর্যবিশিষ্ট পরিভাষা তৈরি করে তিনি তাঁর গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্যে উপনীত হবার সাধনা শুরু করেন। সম্ভবত এটিই ছিল তাঁর সাফল্যের ও 'ইরফানী প্রক্রিয়ার ওপর তাঁর অতুলনীয় প্রভাবের চাবিকাঠি। তিনি দর্শনের ক্ষেত্রে 'আরেফদের আবেদনের আশ্রয় গ্রহণ করেননি। এ কারণে তিনি এ বিষয়টিকে মামুলী ও গুরুত্বহীন বিষয় বলে মনে করেননি– যা দার্শনিক আলোচনার ক্ষেত্রে নতুন ও অপরিচিত বলে পরিগণিত হতে পারে। এ ক্ষেত্রে তিনি শাইখুল ইশরাক শাহাবুদ্দীন সোহ্‌রাওয়ার্দী থেকে ভিন্ন পদ্ধতির আশ্রয় নেন।

মোল্লা সাদরা বিভিন্ন দার্শনিক দাবী ও আরেফদের কতক বক্তব্যের ঊর্ধ্বে উঠে একটি নতুন দর্শন উপস্থাপন করেন। তাঁর এ দর্শনে তিনি বিভিন্ন স্তরের অস্তিত্ব (مراتب

وجود), অস্তিত্বের রূপান্তর, 'বিচারবুদ্ধি প্রয়োগকারী [৩] ও বিচারবুদ্ধি দ্বারা বোধগম্যতার ঐক্য' (إتحاد عاقل و معقول)[৪] এবং আক্‌ল (عقل – বিচারবুদ্ধি)-এর অবস্তুগত অস্তিত্ব হওয়া সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। এভাবে তিনি প্রচলিত দর্শনের বাইরে কোন পদ্ধতি গ্রহণ না করেই ঐশী দর্শন উপস্থাপনে সক্ষম হন।

আমরা যখন ইসলামী ইরফানের সাথে মোল্লা সাদরার ঐশী দর্শন (حكمت الهى)-এর তুলনা করি তখন আমরা দেখতে পাই যে, তিনি দার্শনিক আবেদনের আশ্রয় গ্রহণ করেছেন এবং তাতে ইসলামী 'ইরফানের সাহায্য গ্রহণ করেছেন। তবে 'ইরফানে যা কিছু আলোচিত হয়েছে তার সব কিছুই তিনি দর্শনে আলোচনা করেননি।

এ প্রসঙ্গে তিনটি বিষয় বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য :

প্রথম বিষয়টি এই যে, মোল্লা সাদরা তাঁর দর্শনে 'অস্তিত্বের স্বরূপের মৌলিকত্ব ও একত্ব' (اصالت و وحدت حقيقت وجود) সম্বন্ধে এক অভূতপূর্ব পদ্ধতিতে আলোচনা করেছেন। তিনি এ আলোচনা করেছেন 'ইরফান শাস্ত্রের 'অস্তিত্বের একত্ব' (وحدت وجود) সংক্রান্ত আলোচনার পদ্ধতি থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন এক পদ্ধতিতে।

দ্বিতীয় বিষয়টি হচ্ছে 'কারণ ও ফলাফল'[৫] (cause and effect – علت و معلول) বিধির সম্পর্ক– তিনি যাকে 'বাস্তবতাদান' (تشئون) বলে অভিহিত করেছেন এবং বলেছেন, 'কারণ থেকে ফলাফলের কোন স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নেই; বরং এ হচ্ছে কারণেরই বিভিন্ন পরিচয় (شئون) এর অন্যতম'; এটিকে তিনি 'ইরফান থেকে সমুন্নত দর্শনে (Transcendental Theosophy – حكمة العليا) স্থানান্তরিত করেছেন।[৬]

এ দু'টি বিষয়ের আলোচনায় মোল্লা সাদরা খ্যাতনামা আরেফ (ইসলামী আধ্যাত্মিক সাধক) কায়সারী ও কাওনাভী কর্তৃক ব্যবহৃত পরিভাষাসমূহ ব্যাপকভাবে ব্যবহার করেছেন। তিনিও স্বীকার করেছেন যে, এ দু'টি আলোচনার ভিত্তি 'ইরফানে নিহিত রয়েছে। তিনি *আস্‌ফার্* ও *শাওয়াহেদুর রাবুবীয়্যাহ্* গ্রন্থের তুলনায় *মাফাতীহুল্ গায়ব্* গ্রন্থে অধিক মাত্রায় 'ইরফানের প্রতি তাঁর আকর্ষণ প্রদর্শন করেছেন।

দৃশ্যত মনে হচ্ছে মোল্লা সাদ্‌রার দর্শনের (حكمة) দুর্বল দিকটি হচ্ছে এই যে, তিনি 'ইরফানের নীতিমালায় পরিবর্তন আনয়ন করেছেন এবং তদস্থলে একই ধরনের ভিন্ন ধারণা উপস্থাপন করেছেন। এভাবে তিনি 'ইরফান থেকে দর্শনে (فلسفة) উপনীত

হতে গিয়ে যে অন্তর্বর্তী স্তরটি অতিক্রম করেছেন তাতে তাঁর পা-িত্যের ব্যত্যয় ঘটেছে, যদিও তিনি এর মাধ্যমে সমুন্নত দর্শনের (حكمة العليا) সামনে 'ইরফানী অনুধাবনের পথকে সমুজ্জ্বল করে দিয়েছেন।

এ প্রসঙ্গে এখানে সমকালীন যুগের শ্রেষ্ঠ ও মুক্ত চিন্তার অধিকারী 'আরেফ হযরত ইমাম খোমেইনী (র.)-এর কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। ইসলামী 'ইরফানে অর্জিত তাঁর ব্যতিক্রমধর্মী দক্ষতার সাহায্যে তিনি সমুন্নত দর্শনের একটি নতুন ব্যাখ্যা দেয়ার চেষ্টা করেছেন যা তাত্ত্বিক 'ইরফানের (عرفان نظری) সাথে অধিকতর খাপ খায়। এ ক্ষেত্রে তিনি যে দর্শন মাথায় রেখেছেন তা মোল্লা সাদরার উদ্ভাবিত দর্শনের তুলনায় অধিকতর সমুন্নত। ইমাম খোমেইনী কখনই 'ইরফানের দাবীসমূহকে পরিত্যাগ করেননি; বরং তিনি দর্শনে 'ইরফানের 'অস্তিত্বের একত্ব' আনয়ন ও আল্লাহ্ তা'আলার গুণাবলী নিয়ে আলোচনার ক্ষেত্রে 'ইরফানী দৃষ্টিকোণ অনুসরণের চেষ্টা করেছেন।

ইমাম খোমেইনী 'ইরফান ও ইলাহিয়্যাতের মধ্যে সমন্বয় সাধন করেন। তিনি যেমন কাযা ও কাদ্‌র্[৭] এবং খেলাফতের ন্যায় ইলাহিয়্যাতের বিষয়গুলোকে, তেমনি নাফ্‌স্ (نفس – ব্যক্তিসত্তা/আত্মা) সংক্রান্ত আলোচনাকে 'ইরফানী শিক্ষার সাথে আলোচনা করেছেন। এ ক্ষেত্রে তাঁর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অবদান হচ্ছে এই যে, তিনি তাত্ত্বিক 'ইরফান ও সমুন্নত দর্শনের সাহায্যে উদ্ধৃতি (কালামে নাকলী) ভিত্তিক ইলাহীতত্ত্বকে ব্যাখ্যা করেছেন। আমরা তাঁর গ্রন্থাবলী অধ্যয়ন করলে সহজেই বুঝতে পারি কুরআন মজীদ ও হযরত রাসূলে আকরাম (সা.)-এর পবিত্র আহলে বাইত সূত্রে বর্ণিত হাদীসের ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে তিনি তাঁর 'ইরফানী দৃষ্টিভঙ্গির দ্বারা কতখানি প্রভাবিত হয়েছিলেন!

তবে এখানে তৃতীয় যে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করা প্রয়োজন রয়েছে তা হচ্ছে প্লেটোনিক ধারণা। সমুন্নত দর্শনে প্লেটোনিক ধারণাসমূহের বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। এছাড়াও মোল্লা সাদরা যেসব আলোচ্য বিষয়কে 'ইরফান থেকে দর্শনে স্থানান্তরিত করেছেন এটি তার অন্যতম এবং তিনি একে সমুন্নত দর্শনে উন্নীত করার ক্ষেত্রে অভিন্ন পদ্ধতি অনুসরণ করেছেন। এটি হচ্ছে এমন একটি তত্ত্ব যা অ্যারিস্টটলীয় ধারার ইসলামী দর্শনে (حكمت مشاء)[৮] বর্জিত তত্ত্বসমূহের অন্যতম। কিন্তু মোল্লা

সাদরা একে পুনরুজ্জীবিত করেন এবং এর যথার্থতার সপক্ষে আটটি প্রমাণ উপস্থাপন করেন।

আমরা আমাদের এ প্রবন্ধের দ্বিতীয় অংশে প্লেটোনিক ধারণাসমূহের সপক্ষে মোল্লা সাদরা উপস্থাপিত প্রমাণসমূহ নিয়ে আলোচনা করব। এ প্রসঙ্গে আমরা এ বিষয়টির ওপর জোর দিতে চাই যে, সমুন্নত দর্শনে ও মোল্লা সাদরার বিভিন্ন গ্রন্থে 'ধারণা' সংক্রান্ত তত্ত্ব নিয়ে যে আলোচনা করা হয়েছে তার মূল 'ইরফানে নিহিত রয়েছে যা অপরিবর্তনীয় 'সার' [৯] (essence–جوهر)-এর সাথে অভিন্ন। মোল্লা সাদরা প্লেটোনিক 'ধারণা'র যেসব বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করেছেন তা অপরিবর্তনীয় সারবত্তার বৈশিষ্ট্যসমূহের অনুরূপ।

সুতরাং আমাদের মতে, মোল্লা সাদরা তাঁর ইসলামী 'ইরফানের পটভূমি সহকারে দর্শনের ক্ষেত্রে একটি নতুন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন। প্রথমত তিনি 'ইরফানী চিন্তাধারার আলোকে প্লেটোনিক 'ধারণা'র ব্যাখ্যা করেছেন, দ্বিতীয়ত তিনি 'ইরফানী আদর্শের ওপর নির্ভর করার পাশাপাশি প্রমাণভিত্তিক ভাষা ব্যবহার করেছেন।

আমাদের এ প্রবন্ধে প্লেটোনিক 'ধারণা' সম্বন্ধে মোল্লা সাদরার দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে আলোচনা করব এবং 'ইরফানের সাথে ভালভাবে পরিচিত পাঠকগণ নিজেরাই এ থেকে বুঝতে পারবেন যে, অপরিবর্তনীয় 'সার'-এর বৈশিষ্ট্যসমূহের সাথে 'ধারণা'র বৈশিষ্ট্যসমূহের কতখানি মিল রয়েছে।

ভূমিকা

প্লেটোর শিক্ষক সক্রেটিস বলেন : 'আমি বললাম : অবশ্য আমরা বহুত্বে বিশ্বাস করি অর্থাৎ আমরা বলি, অনেক সুন্দর সুন্দর জিনিস ও অনেক ভাল বা কল্যাণকর জিনিস আছে, তেমনি যে কোন আকৃতির আরও অনেক জিনিস আছে– তার ধরন যা-ই হোক না কেন, তাদের প্রত্যেকের বা প্রতিটিরই একটি নিজস্ব সীমারেখা ও সংজ্ঞা রয়েছে।' 'তিনি বললেন : অবশ্যই।' 'আমি বললাম : অন্যদিকে আমরা বিশ্বাস করি যে, এই বহু প্রজাতির প্রতিটির মধ্যেই একটি অবস্তুগত অস্তিত্ব তথা একটি অবস্তুগত সৌন্দর্য, অবস্তুগত কল্যাণ ও অবস্তুগত অন্য যে কোন কিছু রয়েছে যা এই বহুত্বের জগতে পাওয়া যায়। এগুলো হচ্ছে এই বহুত্বের একটি একক রূপ ও নিরঙ্কুশ অস্তিত্ব।'

'তিনি বললেন : আসলেই তাই।' 'আমি বললাম : আমি আরও বলতে বাধ্য যে, বহুত্বের বিষয়টি বিচারবুদ্ধিগত নয়; বরং দৃষ্টিগ্রাহ্য বিষয়। অন্যদিকে ধারণাগ্রাহ্য আকৃতিসমূহ দৃষ্টিগ্রাহ্য নয়; বরং বিচারবুদ্ধিগ্রাহ্য।'[১০]

প্লেটোর শিক্ষক সক্রেটিস থেকে ওপরে যে কথাগুলো উদ্ধৃত হয়েছে তা হচ্ছে অ্যাডিম্যান্টোস ও গ্লাইকেন-এর সাথে তাঁর বিতর্কের অংশবিশেষ। এতে 'অবস্তুগত রূপসমূহ' (صور المفارقة) সম্বন্ধীয় তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি প্রতিফলিত হয়েছে পরবর্তীকালে যা 'প্লেটোনিক ধারণা' নামে পরিচিত হয়েছে।

প্লেটোর শিষ্য অ্যারিস্টটল এ তত্ত্বের সমালোচনা করেছেন এবং তিনি তাঁর 'অধিবিদ্যা' (*Metaphysics*)[১১] গ্রন্থে এ তত্ত্বের কতগুলো ত্রুটি নির্দেশ করেছেন। ইসলামী দর্শনে গোটা ইতিহাসে অ্যারিস্টটলীয় দর্শনের ছাত্ররা এ ত্রুটিগুলো সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।

ইসলামী 'আরেফগণের মধ্যে প্লেটোনিক ধারণা নিয়ে যথেষ্ট আলোচনা হয়েছে এবং তা ভিন্নমত প্রকাশের অন্যতম উৎস হিসাবে পরিগণিত হয়েছে। ফারাবী ও ইবনে সীনা 'ধারণা' সংক্রান্ত তত্ত্বকে প্রত্যাখ্যান করেছেন। উদ্ভাসন দর্শনে (حكمت اشراق)[১২] পারদর্শী ব্যক্তিগণ, বিশেষ করে শেখ শাহাবুদ্দীন সোহ্‌রাওয়ার্দী তাঁর নিজস্ব ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের ভিত্তিতে 'ধারণা' সংক্রান্ত তত্ত্বকে গ্রহণ করেছেন।

এ তত্ত্বের পটভূমি হিসাবে আমরা এখানে উল্লেখ করতে চাই যে, প্লেটো ও অ্যারিস্টটলের আগেও গ্রীক দার্শনিকদের মধ্যে এ তত্ত্বের প্রতি বিশেষ আকর্ষণ ছিল। মোল্লা সাদরা তাঁর একটি গ্রন্থে[১৩] এ বিষয়টি উল্লেখ করেছেন। তিনি এ তত্ত্বটিকে অ্যাম্পেডোক্লেস, পিথাগোরাস, আগাথাডিমোন ও হার্মেসের সাথে সম্পৃক্ত করেছেন।[১৪] অন্যদিকে 'ধারণা' তত্ত্ব এমনকি সক্রেটিসেরও আগে ছিল বলে ইবনে সীনার লেখায় আলোচিত হয়েছে।[১৫] আর মোল্লা সাদরা স্টোয়িক[১৬] দার্শনিকদের ও প্রাচীন ইরানী দার্শনিকদের সাথেও এ তত্ত্বের সম্পৃক্ততা দেখিয়েছেন।[১৭]

কিন্তু এখানে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে এই যে, মোল্লা সাদরার মতে, ইসলামী দার্শনিকদের মধ্যে 'ধারণা' তত্ত্ব আলোচিত হওয়ার পর এই দার্শনিকদের প্রত্যেকেই এ তত্ত্ব সম্বন্ধে অধিকতর যথার্থ ধারণা লাভের জন্য চেষ্টা করেন, কিন্তু তাঁরা এ ক্ষেত্রে সফল হতে পারেননি। মোল্লা সাদরা বলেন :

'আবু নাস্‌র্ ফারাবীর ন্যায় ব্যক্তিগণ বিচারবুদ্ধির আলোকে তথা যুক্তির সাহায্যে 'উন্মুক্ত ধারণাসমূহ' (مثل المفارقة)-এর বিষয়টি প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন, কিন্তু এ ব্যাপারে সফল হতে পারেননি। প্রকৃতপক্ষে ফারাবী এ তত্ত্বকে অনুধাবনের ক্ষেত্রে ভ্রান্তিতে নিপতিত হয়েছিলেন।'

এ প্রবন্ধে আমরা এ ব্যাপারে ইসলামী দার্শনিকদের মধ্যকার বিভিন্ন দৃষ্টিকোণের কথা উল্লেখ করব এবং এ বিষয়টির প্রতি ইঙ্গিত করব যে, মোল্লা সাদরার দৃষ্টিতে এ বিষয়টির সর্বোত্তম ব্যাখ্যা হচ্ছে ইবনে সীনা প্রদত্ত ব্যাখ্যা। তবে তাঁর মতে, এমনকি ইবনে সীনাও 'ধারণা' তত্ত্ব ও এর অস্তিত্বের তত্ত্বের ব্যাখ্যা দিতে সক্ষম হননি।

সাদরুল মোতাআল্লেহীনের মতে, 'ধারণা' তত্ত্ব বিচারবুদ্ধিভিত্তিক ('আকলী) আলোচনার জন্য উন্মুক্ত করে দেয়ার মত কোন বিষয় নয়; বরং প্রাচীন দার্শনিকগণ তাঁদের প্রত্যক্ষ অনুভূতি (intuition)-এর সাহায্যে 'ধারণা'র অস্তিত্ব আবিষ্কার করেন।[১৮] সাদরুল মোতাআল্লেহীন কুরআন মজীদের কতগুলো আয়াত নিয়েও আলোচনা করেছেন যা 'উন্মুক্ত ধারণা'র অস্তিত্ব প্রমাণ করে।[১৯]

মোল্লা সাদরা এ ব্যাপারে উপসংহারে উপনীত হন যে, ইসলামী দার্শনিকদের কেউই 'উন্মুক্ত ধারণা' তত্ত্ব সঠিকভাবে বুঝতে পারেননি, কেবল তিনিই খোদায়ী মদদে এ ব্যাপারে সফল হয়েছেন।[২০]

প্রথম আলোচনা : 'ধারণা' সম্পর্কে মোল্লা সাদরা

অন্যদের মতামতের সমালোচনা

'প্লেটোনিক ঐশী ধারণা' (مثل های الاهی افلاطون)-কে সুস্পষ্ট ও সহজ অনুধাবনযোগ্য করে তোলার উদ্দেশ্যে মোল্লা সাদরা প্রথমে এ ব্যাপারে অন্যদের মতামতের সমালোচনা করেছেন। এরপর এ ব্যাপারে ইসলামী দার্শনিকদের মতামতের সমালোচনা করার পর তিনি তাঁর নিজের মতামত পেশ করেন।

তিনি প্রথমেই এ ব্যাপারে সংক্ষেপে প্লেটোর বক্তব্য উদ্ধৃত করেন। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন : 'প্লেটোনিক ঐশী ধারণা সম্বন্ধে বলা হয় যে, তাঁর অনেক মতামতই তাঁর শিক্ষক সক্রেটিসের মতামতের সাথে সামঞ্জস্যশীল। উদাহরণস্বরূপ তিনি বলেন, অস্তিত্বসমূহের (موجودات) অবস্তুগত রূপ বা আকৃতি (صورت های مجرد) আছে, আর এ আকৃতিসমূহকে 'ঐশী ধারণা' হিসাবে অভিহিত করা চলে। এ

আকৃতিসমূহ না বিলুপ্ত হয়ে যায়, না ক্ষয়প্রাপ্ত হয় । যা কিছু বিলুপ্ত বা ক্ষয়প্রাপ্ত হয় তা হচ্ছে সৃষ্ট সত্তাসমূহ (موجودات كائنات) বা বস্তুগত জগৎ–অবস্তুগত আকৃতিসমূহ টিকে থাকে ।'[২১]

সাদরুল মোতাআল্লেহীন বলেন যে, প্লেটো 'ধারণা' বলতে আসলে কী বুঝাতে চেয়েছেন এবং সেগুলোর অস্তিত্বের ধরন কী রকম সে সম্পর্কে বিভিন্ন ধরনের মতামত রয়েছে। এরপর তিনি এসব ব্যাখ্যার মধ্য থেকে কতগুলো উদ্ধৃত করেছেন ।[২২]

১. ফারাবীর ব্যাখ্যা

মো'আল্লেমে দুওম (দ্বিতীয় শিক্ষক) নামে খ্যাত আবু নাস্‌র্ ফারাবী তাঁর *আল্-জাম্' বাইনা রা'ইল্ হাকীমাইন্*[২৩] গ্রন্থে বলেন যে, আল্লাহ্‌র জ্ঞানে সৃষ্টিনিচয়ের আকৃতি রয়েছে যা 'সদা বিরাজমান জ্ঞান' (علم حضوری) আকারে রয়েছে। যদিও ব্যক্তিবর্গ ও সত্তাসমূহ কাল ও স্থানের গর্ভে পরিবর্তিত বা বিলুপ্ত হয়ে যায়, কিন্তু ঐ আকৃতিগুলো থেকে যায় ।[২৪]

২. ইবনে সীনার ব্যাখ্যা

ইবনে সীনার মতে, প্লেটো 'আক্‌ল (বিচারবুদ্ধি) সমূহের জগতে (عالم عقول) 'ধারণাসমূহ'-এর অস্তিত্ব বলতে বুঝাতে চেয়েছেন যে, বহুত্ব আকারে (كثيرين) ও বস্তুগত জগতে যে বিশ্বজগৎসমূহ ও 'সার' (Essence– جوهر) সমূহ পাওয়া যায় স্বয়ং সেগুলোই 'আক্‌লসমূহের জগতেও পাওয়া যায় এবং সেখানে তা সাধারণ বা সর্বজনীন আকৃতিতে বিরাজমান রয়েছে । এই 'আক্‌লী সত্তাসমূহ (rational beings) ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতে তাদের নিজেদের দৃষ্টান্ত (مصداق)[২৫]-এর কারণ এবং সেগুলো এগুলোর[২৬] অগ্রবর্তী ।[২৭]

৩. শাইখুল ইশরাকের[২৮] ব্যাখ্যা

যে কোন সহজ ও সাধারণ সৃষ্টি, যেমন মহাশূন্যলোক ও বিভিন্ন মৌলিক উপাদান এবং যৌগিক সৃষ্টি, যেমন উদ্ভিদরাজি ও প্রাণীকুল– 'আক্‌লের জগতে এগুলোর স্বতন্ত্র 'আক্‌লী রূপ আছে যা এসব সৃষ্টির বস্তুগত রূপ থেকে স্বতন্ত্র এবং সেগুলোই হচ্ছে এসব সৃষ্টির আদি রূপ । আদি রূপ ও এগুলোর প্রাকৃতিক নিদর্শনের মধ্যে সম্পর্ক এই

যে, প্রতিটি সৃষ্টির আদি রূপ সংশ্লিষ্ট প্রাকৃতিক নিদর্শনকে পরিচালিত বা নিয়ন্ত্রণ করে এবং এগুলোর দেখাশোনা করে। যেহেতু এসব 'আক্‌লী অস্তিত্বের প্রতিটিই অসংখ্য 'আক্‌লী অস্তিত্বের ব্যাপ্তির ধারাবাহিকতার কোন না কোন প্রান্তিকতায় অবস্থান করে সেহেতু এগুলো অনেকটা ঘটনাক্রমে এ অবস্থানের অধিকারী বলে মনে হতে পারে। বস্তুগত অস্তিত্বের বহুত্বের ভিত্তিতে এ 'আক্‌লী অস্তিত্বগুলো অসংখ্য। অতএব, প্রতিটি বস্তুগত অস্তিত্বেরই একটি বিশেষ 'আক্‌লী অস্তিত্ব ও স্বতঃবিরাজমান ধারণা রয়েছে যা এসব সৃষ্টির উৎস।[২৯]

৪. মোহাক্কেক দাওয়ানীর ব্যাখ্যা

ধারণাসমূহের জগতের স্থগিত সত্তাসমূহের সাথে– অন্যান্য দার্শনিকগণও যাতে বিশ্বাস করেন– প্লেটোনিক ধারণাসমূহ অভিন্ন।[৩০]

৫. মীর দামাদের ব্যাখ্যা

সমস্ত ইহজাগতিক বা কালিক ও বস্তুগত অস্তিত্বই কাল, স্থান ও শর্তাবলীর মুখাপেক্ষী। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলার ক্ষেত্রে– যার জ্ঞান হচ্ছে সমুদ্ভাসন ও প্রত্যক্ষ অনুভূতিভিত্তিক জ্ঞান, এর সবগুলোই অভিন্ন স্তরের; এ ক্ষেত্রে কোনটির ওপর কোনটির প্রাধান্য নেই। সুতরাং এ দিকটির বিবেচনায়, এ অস্তিত্বসমূহের কোনটিরই না নবায়ন আছে, না ক্ষয় আছে, না অনিশ্চিত সম্ভাবনা আছে। এ প্রত্যক্ষ অনুভূতির ক্ষেত্রে এগুলোর জন্য আদি বস্তুর গতিশীলতা বা বস্তুগত শর্তাবলীর কোনই প্রয়োজনীয়তা নেই। এ দৃষ্টিকোণ থেকে এগুলোকে অবস্তুগত অস্তিত্ব বলে গণ্য করা হয়।[৩১]

বিখ্যাত ইসলামী দার্শনিকগণের উপরিউক্ত মতামত উদ্ধৃত করার পর সাদরুল মোতাআল্লেহীন শীরাযী এ সব মতের সমালোচনা করেন।

ফারাবীর মতের সমালোচনা

সাদরুল মোতাআল্লেহীন শীরাযী বলেন : 'মো'আল্লেমে দুওম আবু নাস্‌র্ ফারাবীর ধারণার বিপরীতে প্লেটোনিক 'ধারণাসমূহ' কতগুলো স্বাধীন ও স্বতঃঅস্তিত্বমান অস্তিত্ব যা বাহ্যিক বাস্তবতায়ও রয়েছে। এগুলো অন্যরা যে ধরনের জ্ঞানের অধিকারী সে

ধরনের জ্ঞান বা অর্জিত জ্ঞানের অনুরূপ জ্ঞান নয়। প্লেটো বলেছেন বলে উদ্ধৃত হয়েছে : 'অবস্তুগত অবস্থায় আমি আলোকোদ্ভাসিত স্তরসমূহ প্রত্যক্ষ করেছি।'[৩২]

তেমনি হার্‌মেস্ (Hermes) থেকে উদ্ধৃত হয়েছে যে, তিনি বলেছেন : 'একটি আত্মিক সত্তা আমাকে জ্ঞান দান করেছেন। আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম : আপনি কে? তিনি বললেন : আমি তোমার পূর্ণাঙ্গ ও পরিপূর্ণ প্রকৃতি।'

অতএব, এ থেকে সুস্পষ্ট যে, অতীতের দার্শনিকগণ ও প্লেটোর মত অনুযায়ী ধারণা স্বাধীন এবং তা 'বস্তুর মধ্যে নেই'।

(চলবে)

অনুবাদ : নূর হোসেন মজিদী

---

১ মূল আলোচনা থেকে সুস্পষ্ট হয়ে যাবে যে, এখানে 'প্লেটোনিক ধারণা' (ideas – বহুবচন) বলতে প্লেটোর তত্ত্বসমূহ (theories) সম্পর্কে মোল্লা সাদরার মতামত তুলে ধরা উদ্দেশ্য নয়; বরং এখানে 'ধারণা' (ideas) মানে হচ্ছে বস্তুলোকের সব কিছুরই একেকটি সাধারণ অবস্তুগত রূপ আছে যা এসব সৃষ্টি অস্তিত্বলাভ করার আগে থেকেই বিদ্যমান এবং এমন অনেক রূপও আছে বস্তুজগতে যা অস্তিত্বশীল নয়, বা এখনও অস্তিত্বশীল হয়নি– যেগুলোর দুর্বল তুলনা হচ্ছে মানুষের মস্তিষ্কে স্থিত কল্পচিত্র বা পরিকল্পনা। কিন্তু মানুষের মস্তিষ্কের কল্পচিত্র বা পরিকল্পনা থেকে এর মৌলিক পার্থক্য হচ্ছে এই যে, মানুষের মস্তিষ্কের কল্পচিত্র বা পরিকল্পনা যেখানে উদ্ভব ও স্থিতির জন্য মস্তিষ্কের তথা মানুষের ওপর নির্ভরশীল সেখানে আলোচ্য ধারণাগুলো কোন কিছু বা কারও ওপর নির্ভরশীল নয়; বরং স্বাধীন ও স্বতঃঅস্তিত্বশীল এবং এগুলো অবস্তুগত বিচারবুদ্ধি জাতীয় ('আক্‌লী – عقلی) সত্তা– এটিই প্লেটোর মত। যেহেতু সর্বপ্রথম প্লেটোই এ ধরনের 'আক্‌ল রূপ ধারণার কথা বলেছেন সেহেতু এগুলো 'প্লেটোনিক ধারণা' (Platonic ideas) নামে পরিচিত হয়েছে। অনেক দার্শনিক প্লেটোর এ মত গ্রহণ করেননি, আবার অনেকে এ মত গ্রহণ করলেও এর সঠিক তাৎপর্য বুঝতে পারেননি। মোল্লা সাদরা প্লেটোর মতকে গ্রহণ করে উপরিউক্ত উভয় গোষ্ঠীরই ভ্রান্তি নির্দেশ করেছেন এবং প্লেটোর মতের সঠিক তাৎপর্য উপস্থাপনসহ তার সঠিক ব্যাখ্যা দিয়েছেন।

এখানে দর্শনের সাথে তেমন একটা পরিচয় নেই এমন পাঠকদের কাছে বিষয়টি অপেক্ষাকৃত সহজবোধ্য করার জন্য উল্লেখ করা যেতে পারে যে, অনেক দার্শনিকই 'সাধারণ সর্বজনীন প্রজাতিসমূহের' প্রবক্তা, প্লেটোনিক ধারণার সাথে যার অনেকাংশে

মিল আছে। এই 'সাধারণ প্রজাতিসমূহের' ধারণা হচ্ছে বস্তুগত অস্তিত্বের বাইরে প্রতিটি প্রজাতির সাধারণ অবস্তুগত অস্তিত্ব থাকার ধারণা। উদাহরণস্বরূপ, আপনি, আমি ও বিশ্বের অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যতের সকল মানুষকে বাদ দিয়ে শুধু 'মানুষ'-এর একটি ধারণা (مفهوم) আছে যা সকলের প্রতি সমভাবে প্রযোজ্য (যাদের বেলায় প্রযোজ্য তাদের প্রত্যেককে উক্ত مفهوم-এর مصداق বা দৃষ্টান্ত বলা হয়) – যে ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট আকার, রং, উচ্চতা, আয়তন ও বস্তুগত উপাদান প্রযোজ্য নয় (কারণ, তাহলে তা সুনির্দিষ্ট ব্যক্তির বেলায় প্রযোজ্য হলেও সকলের বেলায় প্রযোজ্য হবে না)। অর্থাৎ মানুষ সংক্রান্ত ধারণায় প্রতিটি বাস্তব মানুষের জন্য স্বতন্ত্রভাবে আকার, রং, উচ্চতা, আয়তন ও বস্তুগত উপাদানের 'ধারণা' থাকবে, তবে বাস্তব মানুষের বাইরে সাধারণভাবে 'মানুষ' সংজ্ঞার ক্ষেত্রে তা সুনির্দিষ্ট হবে না; বরং অনির্দিষ্ট থাকবে, ফলে এসব সীমাবদ্ধতা থেকে মুক্ত 'মানুষ' ধারণাটি সকলের বেলায় প্রযোজ্য হয়েছে, হচ্ছে ও হবে। এ ধারণাই হচ্ছে 'সাধারণ বা সর্বজনীন মানুষ' (انسان کلی)। অনেক দার্শনিকের মতেই এ ধরনের 'সাধারণ বা সর্বজনীন মানুষ', 'সাধারণ বা সর্বজনীন গরু' ইত্যাদি রয়েছে। একটি মত হচ্ছে এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা প্রথমে 'সাধারণ বা সর্বজনীন প্রজাতিসমূহ' (موجودات کلی) সৃষ্টি করেন এবং তাঁর নির্দেশে সেগুলোকে মডেল হিসাবে গ্রহণ করে তার ভিত্তিতে ফেরেশতারা প্রজাতিসমূহের বস্তুগত অবয়ব সৃষ্টি করেন। প্লেটোনিক ধারণা ও 'সাধারণ বা সর্বজনীন প্রজাতিসমূহ'-এর মধ্যে অন্যতম পার্থক্য এই যে, বাস্তব প্রজাতির সংখ্যা ও 'সাধারণ বা সর্বজনীন প্রজাতি'র সংখ্যা অভিন্ন, কিন্তু প্লেটোনিক ধারণাসমূহের জন্য বাস্তব প্রজাতিসমূহের সমসংখ্যক হওয়া জরুরি নয়।

তৃতীয় পর্যায়ে রয়েছে প্রাণীকুলের অবস্তুগত সত্তা (নাফ্স্)– যা আমরা অনুভব করি এবং যা প্রতিটি প্রাণীসদস্যের জন্য স্বতন্ত্র। অনেকের মতে এগুলো বস্তুদেহ সৃষ্টির সমসময়ে বস্তুদেহকে আশ্রয় করে সৃষ্টি করা হয়, কিন্তু সৃষ্ট হবার পর তা বস্তুদেহ থেকে পৃথক অস্তিত্বের অধিকারী হয় এবং এ কারণে বস্তুদেহের ধ্বংসের ফলে তার ধ্বংস হয় না। কিন্তু অনেকে মনে করেন, নাফ্স্গুলো প্রজাতিসমূহের বাস্তব সৃষ্টির সূচনার আগেই সৃষ্টি করে রাখা হয়েছিল। নাফ্স্ সম্পর্কিত ধারণা এই যে, এগুলো হুবহু বস্তুদেহের অনুরূপ, কিন্তু আয়নায় প্রতিফলিত প্রতিবিম্বের ন্যায় বস্তুশূন্য।

নাফ্স্ সম্বন্ধে আরও অনেক মত ও আলোচ্য বিষয় আছে। এ ছাড়া আরও অনেক ধরনের অবস্তুগত অস্তিত্ব রয়েছে। অনূদিত প্রবন্ধের বক্তব্য অপেক্ষাকৃত সহজ অনুধাবনযোগ্য করার জন্য এখানে এতটুকু আভাস দেয়াই যথেষ্ট বলে মনে করি।– অনুবাদক

২ পুরো নাম সাদরুদ্দীন মোহাম্মাদ বিন্ কাওয়াম্ শীরাযী। তিনি ৯৮০ হিজরিতে (১৫৭২ খ্রি.) ইরানের শীরাযে জন্মগ্রহণ করেন।– অনুবাদক

৩ عاقل ('আাকেল) একটি কতৃবাচক বিশেষ্য (اسم فاعل) এবং এ হিসাবে সে যখন কোন কিছুকে আয়ত্ত করে তথা কোন কিছু সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করে তখন এর অর্থ 'বিচারবুদ্ধি প্রয়োগকারী' বা 'বিচারবুদ্ধি দ্বারা আয়ত্তকারী', কিন্তু এটি সাধারণভাবে গুণবাচক নাম হিসাবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে এবং সে হিসাবে এর অর্থ 'বিচারবুদ্ধির অধিকারী'। – অনুবাদক

৪ এ তত্ত্বের মূল কথা হচ্ছে, নাফ্স্ (যে বিচারবুদ্ধির অধিকারী–عاقل) যখন কোন বিষয়কে বিচারবুদ্ধি দ্বারা অধীন করে নেয় অর্থাৎ ঐ বিষয় সম্পর্কে জ্ঞানের অধিকারী হয় তখন ঐ জ্ঞানরূপ অবস্তুগত অস্তিত্বটি তার সত্তার অবিচ্ছিন্ন গুণে পরিণত হয়ে যায় তথা তা তার সত্তার সাথে একীভূত হয়ে যায়।– অনুবাদক

৫ দর্শন ও বস্তুবিজ্ঞান উভয় শাস্ত্রেই এটি একটি মৌলিক গুরুত্বপূর্ণ পরিভাষা। বাংলা ভাষায় সাধারণত ইংরেজি পরিভাষা cause and effect-এর অনুবাদ করা হয় 'কার্যকারণ বিধি'। কিন্তু এটি সঠিক অনুবাদ নয়, কারণ, ইংরেজি effect শব্দের প্রথম তাৎপর্য (first meaning) 'কাজের ফলাফল'। অন্যদিকে আরবি পরিভাষা علت و معلول cause and effect-এর চেয়েও অধিকতর নিখুঁত ও অধিকতর সুস্পষ্ট তাৎপর্য জ্ঞাপক এবং তার অনুবাদ 'কার্যকারণ' করা হলে তা মোটেই ঠিক হবে না।– অনুবাদক

৬ بسيط الحقيقة كل اشياء (সকল কিছুর স্বরূপ অবিভাজ্য সত্যতা) মূলনীতি 'ইরফানের অন্যতম প্রধান আলোচ্য বিষয় যা এ দু'টি বিষয় থেকে উদ্ভূত।

৭ قضاء و قدر ইসলামী 'আকায়েদের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ আলোচ্য বিষয়। কাযা' মানে 'ফায়সালা' আর কাদ্র্ মানে 'পরিমাণ'। সংক্ষেপে বলা যায়, এখানে কাযা' মানে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর সমগ্র সৃষ্টিপরিকল্পনায় যে মৌলিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো আগেই নির্ধারণ করে রেখেছেন, যেমন মানুষের সৃষ্টি ও তাকে পৃথিবীর বুকে খেলাফত প্রদান এবং রাসূলে আকরাম হযরত মুহাম্মাদ (সা.)-কে প্রেরণ; আর কাদ্র্ মানে হচ্ছে 'কারণ ও ফলাফল' বিধি।– অনুবাদক

৮ مشاء (মাশ্শা') শব্দের মানে হচ্ছে 'যে অনেক বেশি পথ চলে'। অ্যারিস্টটল পথ চলতে চলতে তাঁর দার্শনিক বিষয়াদি বর্ণনা করতেন এবং তাঁর শিষ্যরা তাঁর সাথে পথ চলতে চলতে তা শুনে শিক্ষা করতেন। এ কারণে তাঁর অনুসারীদের 'অনেক বেশি পথ পরিক্রমণকারী' (مشائين) ও তাঁর দর্শনকে 'মাশ্শায়ী দর্শন' (حكمت مشائى) বলা হয়। (فرهنگ عميد)– অনুবাদক

৯ جوهر (essence) মানে যে কোন কিছুর মৌলিক উপাদান। অনেকে এর অনুবাদ করেন 'সারবস্তু'। কিন্তু যেহেতু সৃষ্টি কেবল বস্তুগত (مادى) নয়, অবস্তুগত (مجرد)ও, সেহেতু শুধু 'সার' অনুবাদ করাই বিধেয়।– অনুবাদক

১০ Plato, *Republic*, Book VI.

১১ Aristotle, *Metaphysics*, Book VII, Chapter 14.

[১২] ইশরাক দর্শন হচ্ছে কাশ্‌ফ্‌ ও শুহূদের মাধ্যমে সত্যসমূহে উপনীত হওয়ার ওপরে ভিত্তিশীল দর্শন। এ দর্শনের উদ্গাতা এবং ইরানে ও ইসলামে এর প্রবর্তক শেখ শাহাবুদ্দীন সোহ্‌রাওয়ার্দী। তিনি অ্যারিস্টটলীয় দর্শন ও ইরানে প্রচলিত দর্শনের পর্যালোচনা করে এ দর্শনের উদ্ভাবন করেন। (فرهنگ عميد)– অনুবাদক

[১৩] সাদরুল মোতাআল্লেহীন শীরাযী : *মাফাতীহুল্‌ গ্বায়ব্‌*, পৃ. ৪১৮।

[১৪] সাদরুল মোতাআল্লেহীন শীরাযী : *আল্‌-আসফার্‌*, ৫ম খণ্ড, পৃ. ১৬৩।

[১৫] আবু আলী ইবনে সীনা : *আশ্‌-শিফা*, পৃ. ৩৪০।

[১৬] গ্রীক দার্শনিক জেনো-র মতাবলম্বী।– অনুবাদক

[১৭] সাদরুল মোতাআল্লেহীন শীরাযী : *মাফাতীহুল্‌ গ্বায়ব্‌*, পৃ. ৪৩৬; *আল্‌-মাব্‌দা ওয়াল্‌ মা'আদ্‌*, পৃ. ১৪১; *আশ্‌-শাওয়াহেদুর্‌ রুবুবিয়্যাহ্‌*, পৃ. ১৭১।

[১৮] সাদরুল মোতাআল্লেহীন শীরাযী : *মাফাতীহুল্‌ গ্বায়ব্‌*, পৃ. ৪৪৭।

[১৯] প্রাগুক্ত।

[২০] সাদরুল মোতাআল্লেহীন শীরাযী : *হাশিয়ায়ে শার্‌হে হিকমাতুল্‌ ইশরাক্ব*, পৃ. ২৫১ ও ৩৭৫।

[২১] সাদরুল মোতাআল্লেহীন শীরাযী : *আল্‌-আস্‌ফার্‌*, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৬।

[২২] দ্রষ্টব্য, সাদরুল মোতাআল্লেহীন শীরাযী : *আল্‌-আস্‌ফার্‌*, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৮ ও তদপরবর্তী পৃষ্ঠাসমূহ; *হাশিয়ায়ে শার্‌হে হিকমাতুল্‌ ইশরাক্ব*, পৃ. ২৫১।

[২৩] *দুই দার্শনিকের মতের মধ্যে সমন্বয়*।

[২৪] ফারাবী : *আল্‌-জাম' বাইনা রা'এল্‌ হাকীমাঈন*, পৃ. ১০৬।

[২৫] مصداق-এর তাৎপর্য ১ নং অন্ত্যটীকায় উল্লিখিত হয়েছে।– অনুবাদক

[২৬] অর্থাৎ বস্তুজাগতিক অস্তিত্বসমূহের।– অনুবাদক

[২৭] ইবনে সীনা : *আশ্‌-শিফা*, পৃ. ২০৪, ৩১১ ও ৩১৮; *আল্‌-বুরহান*, পৃ. ১১৮; *আল্‌-মুবাহিছাহ্‌*, পৃ. ৩৭০।

[২৮] শেখ শাহাবুদ্দীন সোহ্‌রাওয়ার্দীর উপাধি। তিনি হিকমাতে ইশরাক (উদ্ভাসন দর্শন)-এর প্রবর্তক বিধায় তাঁকে এ উপাধিতে ভূষিত করা হয়েছে।– অনুবাদক

[২৯] সোহ্‌রাওয়ার্দী : *হিকমাতুল্‌ ইশ্‌রাক্ব*, *শাইখুল ইশরাকের রচনাসমগ্র*, ২য় খণ্ড, পৃ. ৯২; *আত্‌-তাল্‌ভীহাত্‌*, *শাইখুল ইশরাক্বের রচনাসমগ্র*, ১ম খণ্ড, পৃ. ৬৮।

[৩০] মোহাকেক্ব দাভানীর গ্রন্থাবলিতে এ তত্ত্ব পাওয়া যায় না; বরং তিনি তাঁর *শাওয়াকিলুল্‌ হূর্‌ ফী শার্‌হে হায়াকিলিন্‌ নূর* গ্রন্থে (পৃ. ১৮৭) ধারণাসমূহকে 'আকলী অস্তিত্ব বলে ব্যাখ্যা করেছেন।

[৩১] মীর দামাদ : *আল্‌-কাবাসাত্‌*, পৃ. ১৫০।

[৩২] সাদরুল মোতাআল্লেহীন শীরাযী : *আল্‌-আস্‌ফার্‌*, ২য় খণ্ড, পৃ. ৫০।

(সূত্র : তেহরান থেকে প্রকাশিত ম্যাগাজিন Al-Tawhid, Volume 15, No. 4, 2000 থেকে অনূদিত)